ফ্রিডরিখ্ ম্যাক্সমূলার প্রণীত

রামকৃষ্ণদেব

জীবন ও বাণী

: অনুবাদ :

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
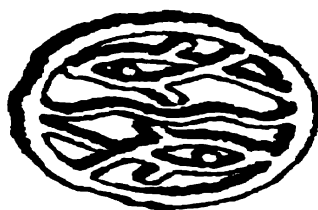
সু ব র্ণ রে খা

৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশকের কথা

ভারততত্ত্ব চর্চায় যে ক'জন বিদেশী মনস্বী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে জার্মানীর সুপরিচিত ভাষাতত্ত্ববিদ ফ্রিডরিখ্ ম্যাক্সমূলারের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রুশিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আনহাল্ট রাজ্যের রাজধানী দেসাউ শহরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিবান পরিবারে ম্যাক্সমূলারের জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। প্রথমে তিনি গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়ন শুরু করেন। লাইপস্‌টসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারমান ব্রকহাউসের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি প্রথম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হন। পরবর্তীকালে তিনি বার্লিনের প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী বোপের নিকট তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা লাভ করেন। বোপের নিকট কিছুকাল তিনি সংস্কৃতও অধ্যয়ন করেন। একই সংগে তিনি দার্শনিক শ্রেষ্ঠ এফ. ডবলু. শিলিংএর নিকট দর্শন, বিশেষতঃ হিন্দু দর্শন চর্চা শুরু করেন। কিছুকাল পরে তিনি প্যারীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ বুর্ণুফের তত্ত্বাবধানে বিস্তৃতভাবে সংস্কৃত চর্চায় মনোনিবেশ করেন। মূলতঃ বুর্ণুফের অনুপ্রেরণাতেই ম্যাক্সমূলার সায়নাচার্যের ভাষ্য সহ ঋগ্বেদের সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উত্তর জীবনে ম্যাক্সমূলার সংস্কৃত ভাষা চর্চা এবং হিন্দু দর্শনে যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাতে এই সকল বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতদের অবদান কম ছিল না।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমূলার স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ডে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৮৬১ খৃ: থেকে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি লণ্ডনস্থ রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে ভাষা-বিজ্ঞানের ওপর কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতাগুলি সুধী মহলে বিশেষভাবে আদৃত হয় এবং বহু জ্ঞানী-গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতঃপূর্বে ইংল্যাণ্ডে ভাষা বিজ্ঞানের বিশেষ কোন চর্চা ছিল না। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, ম্যাক্সমূলারই ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তন করেন। আধুনিক ইউরোপীয় কেল্টিক ভাষাসমূহের সহিত সংস্কৃত ভাষার জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার ম্যাক্স-মূলারের জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি।

ভাষা বিজ্ঞানের ন্যায় তুলনামূলক ধর্ম ও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পুরাণ কথাসমূহের তুলনামূলক আলোচনার ধারাও সর্বপ্রথম ম্যাক্সমূলারই প্রবর্তন করেন। তুলনামূলক ধর্মবিষয়ে ম্যাক্সমূলার ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতা দেন। এই বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে "সেক্রেড বুকস্ অফ দি ইস্ট" গ্রন্থমালার দ্বারা তিনি বিশ্ববিদ্যার এই শাখাকে সুদৃঢ় ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বর্তমানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আধ্যাত্মিক মিলন স্থিতধী মানুষ মাত্রেরই কাম্য, কিন্তু এক শতাব্দী আগে ম্যাক্সমূলার এই গ্রন্থমালার সাহায্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের হার্দ্য সম্পর্কের পথ সূচীত করে রেখে গেছেন।

ম্যাক্সমূলার দর্শনের একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। আর এই দর্শনানুরাগ নিয়েই তিনি হিন্দু দর্শন বিশেষভাবে বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। বেদান্ত দর্শনের ওপর তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দেন এবং পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'সিক্স সিস্টেম অফ ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' গ্রন্থে তিনি হিন্দুর ষড়দর্শন এবং ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে দেখিয়েছেন ভারতীয় দর্শন কি ভাবে ভারতের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়ানের প্রায় এগারো বারো বৎসর পরে।

শ্রীশ্রী সারদামণি তখনো জীবিত। স্বামী বিবেকানন্দ তখন অসংখ্য শিষ্যদের নিয়ে বেদান্ত প্রচারের মাধ্যমে ঠাকুরের ভাবধারা পৃথিবীতে প্রচার করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই গ্রন্থ রচনার আগে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমূলারের সংগে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়। ইতঃপূর্বে তিনি কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের নিকট হতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থে ঠাকুরের উপদেশাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যুগাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণ উচ্চারিত মহৎ ভাবধারা যে দেশের জনমানসে প্রবাহিত হচ্ছে সেই দেশবাসীকে পৌত্তলিকজ্ঞানে তিমিরাচ্ছন্ন মধ্য আফ্রিকার লোকদের ন্যায় ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা যুক্তিযুক্ত কিনা তা বিচার সাপেক্ষ। তিনি আরো লিখেছেন বেদান্তকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে পারলে কি পরিমাণ পবিত্রতা, সারল্য ও নিঃস্বার্থপরতা অর্জন করা যায়—ঠাকুরের জীবন ও বাণী তারই মূর্ত দৃষ্টান্ত। স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাক্সমূলারের ভারতানুরাগ, জ্ঞানের গভীরতা ও মানসিক শক্তির দৃঢ় অভিব্যক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত স্বামিজীর লেখাতেই পাওয়া যায়। স্বামিজী একজায়গায় লিখেছেন "ম্যাক্সমূলার ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ ভালবাসেন, আমি আমার মাতৃভূমিকে তার শতাংশের এক ভাগ ভালবাসতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করতাম।"

তৎকালীন, বঙ্গসমাজের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের খ্যাতনামা মণীষী এবং কর্মযোগী পুরুষদের অনেকের সঙ্গেই ম্যাক্সমূলারের ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বর্তমান ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আত্মিক সংঘর্ষ ও সন্ধিসূত্রে উজ্জীবিত ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলাদেশে—তখন উনিশ শতকের প্রান্তসূর্য প্রখর তেজোরশ্মিতে দীপ্যমান, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজচিন্তা, প্রচণ্ডভাবে আলোড়ন-উদ্ভাসিত—এমন কি রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষও ঐ সকল চিন্তাধারার অনিবার্য ফলশ্রুতি। ম্যাক্সমূলার, প্রাচীন ঐতিহ্য আশ্রয়ী স্বতঃস্ফূর্ত ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতিটি তরঙ্গের সংগে পরিচিত হবার প্রচেষ্টায় ঐকান্তিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু

সে পরিচয় যে সবসময় প্রীতিকর হতো এমন নয়, কেননা প্রতীচীর খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিক্রিয়া ছিল দুস্তরভাবে ব্যবধান বিস্তৃত। তথাপি তিনি যে বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় মানসের গুনগ্রাহী হতে পেরেছিলেন তার কারণ বোধ হয় অন্যত্র; তৎকালীন মূঢ় ও উদ্ধত প্রকৃতির ইংরেজ প্রভুদের নাসিকাকুঞ্চনকে অবজ্ঞা করে তিনি যে ভারতীয় চিন্তাধারারূপী অতল জ্ঞানসমুদ্র থেকে মূল্যবান মণি-মাণিক্য আহরণ করতে পেরেছিলেন; কেননা তিনি সাহেব হলেও জন্মসূত্রে ছিলেন জর্মন, সর্বোপরি ছিল তাঁর সূক্ষ্ম যুক্তিবিচার আর ন্যায়ের দুর্লভ ক্ষমতার অধিকার। এবং এই কারণেই বোধ হয় একই সংগে তিনি সহৃদয় ভারতপ্রেমিক এবং ভারত-বিদ্যাচর্চায় নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহী হতে পেরেছিলেন। হয়তো এবম্প্রকার বিরল সমন্বয়ের গুণেই তিনি বোধের সংগে বোধিকে একাত্ম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের প্রত্যুষে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ ও তার মহিমা কীর্তনের দ্বারা ম্যাক্সমূলার ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছিলেন। ভারতবাসী ম্যাক্সমূলারের এই অক্লান্ত ভারত মহিমা কীর্তনে হৃত-বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল। কেননা, অতীত ঐতিহ্যের সচেতনতা জাতীয় জাগরণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

প্রধানতঃ ভারততত্ত্ববিদ্‌রূপে পরিচিত হলেও ম্যাক্সমূলার ছিলেন অসাধারণ সুপণ্ডিত, শাস্ত্রবিৎ ও দার্শনিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষেও তিনি বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পান নি। তথাকথিত উন্নাসিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে ভারতবাসীর মনে যে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, তারই প্রকাশ ঘটেছিল ম্যাক্সমূলারের ভারত প্রীতির বেলাতেও।

প্রভূত নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও চিন্তার সততা ম্যাক্সমূলারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তির অবতারণা

করতেন, সত্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর দুর্মর। তাঁর বিশ্বাস ছিল সংস্কৃত ভাষা-চর্চা তথা ভারতবিদ্যা-চর্চা আধুনিককালে সামগ্রিকভাবে সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রভূত উন্নতি সাধন করবে এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিবর্তনের ইতিবৃত্ত প্রতীচ্যবাসীর আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবনচর্যার উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করবে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর পরিণত বয়সে অক্সফোর্ডে মণীষী ম্যাক্সমূলার লোকান্তরিত হন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভূয়সী প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করেছিলেন।

বহুকাল পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অধুনা ঐ গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমরা বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশ করলাম। বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা ও নির্দেশের জন্য শ্রীকমলকুমার মজুমদারের নিকট আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁর সুচিন্তিত মূল্যবান অভিমত দ্বারা, উদ্যোগপর্বে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। গ্রন্থটি সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছেন শ্রীসলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ-বাণী অংশে পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় কোন কোন বাণী আমরা পরিবর্জন করলাম, আশা করি পাঠকবর্গের এতে কোন অসুবিধা হবে না। সহৃদয়সংবাদী পাঠক পাঠিকাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হলেই আমাদের উদ্যম ও পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

ই. ম.

ভূমিকা

রামকৃষ্ণের নামটি কিছুকাল পূর্বে ভারতীয়, মার্কিন ও বৃটিশ সংবাদপত্রে অসংখ্যবার উল্লেখিত হতে দেখে আমার মন বলছিল যে তাঁর জীবন ও ধর্ম বিষয়ে একটা পরিপূর্ণ আলেখ্য হয়তো নানা মহলে আদৃত হবে। এমন অনেক আছেন যাঁরা ভারতের মনীষা ও নৈতিক জগত সম্বন্ধে আগ্রহশীল। আবার এমনও কেউ-কেউ আছেন যাঁদের কাছে ঘরে-বাইরে ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশের বিষয়টি কখনোই মনোযোগের অযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং আমি সদ্য দেহান্তরিত এই ভারতীয় সন্ত (তিরোভাব ঃ ১৮৮৬) সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহে প্রয়াস পেয়েছি। এই তথ্যসমূহ আমি অংশত রামকৃষ্ণের ভক্তশিষ্যদের কাছ থেকে, অংশত ভারতীয় সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা সম্বলিত 'গ্রন্থাবলী' থেকে সংগ্রহ করেছি। লঘু-গুরু নানা ভাবে নানা অবস্থায় তিনি যে-সব ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেশ দিয়েছেন—যার বর্ণনা ও আলোচনা নানা পুস্তকে বিধৃত—তা থেকেও নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

ভারতীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, যাঁদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ যুক্ত ছিলেন তাঁদের স্খলন-পতন সম্পর্কে যা-কিছুই বলা হোক না কেন, মানতেই হবে এঁদের মধ্যে এমন কেউ-কেউ আছেন যাঁরা কেবল আমাদের আগ্রহ নয়, আমাদের হৃদয়ের উত্তাপ পাবার অধিকারী। আবার এমন কেউ-কেউ আছেন যাদের ঠিক সন্ন্যাসী বলা যায় না, তুকতাক ভেল্কিবাজির উর্ধ্বে নন তারা, হঠযোগীর চেয়ে বেশি-কিছু নন। তাদের আত্মনিগ্রহ, কঠোর নিয়মরীতির প্রয়োগে রিপুদমনের প্রযত্ন এবং উদ্দাম স্নায়বিক উল্লাস, উল্লাসের মত্ততার পর মূর্চ্ছা ও দীর্ঘস্থায়ী সংজ্ঞাহীনতা—এবম্বিধ ব্যাপার

আমাদের মধ্যে যাঁরা ভারতবর্ষে বসবাস করেছেন তাঁদের কাছে সুবিদিত ; তাঁরা একদিকে যেমন রাজা-মহারাজার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় জটিল সমাজব্যবস্থার অঙ্গীভূত এই সব বিচিত্র জীবনের সঙ্গেও। দেহ-মনে আত্মনিগ্রহী আত্মোৎসর্গকারী এই সব ব্যক্তিদের নিয়ে অনেক কাহিনী আছে যা অতিরঞ্জিত। এতৎসত্ত্বেও এমন কতকগুলি সত্য ঘটনাও আছে যা সর্বাবস্থায় আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করে। পরন্তু ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসাকল্পে যখন কোনো-কোনো খাঁটি সন্ন্যাসী তাঁদের চিন্তা ও অনুধ্যান প্রয়োগ করেন তখন তাঁদের মুখনিঃসৃত বাণী তাঁদের আপন দেশে শত শত মানুষকে আবিষ্ট করে, ওই পরম বাণী শোনবার জন্য তারা সন্ন্যাসীদের ঘিরে জমায়েত হয়। সে-বাণীর আবেদন আমাদের হৃদয়-মনের কাছেও ব্যর্থ হয়না, বিশেষত যদি রামকৃষ্ণের মতো তাঁদের ধর্মীয় সুসমাচার উৎসাহী প্রচারকদের মারফৎ শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের মাটি পেরিয়ে সুদূর ইংল্যাণ্ড-আমেরিকাতেও বিস্তারলাভ করে।

আমাদের এ-আশঙ্কার কারণ নেই যে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা ইওরোপে তাঁদের অনুগামী বা অনুসারকদের কস্মিনকালেও খুঁজে পাবেন, সে-রকম কোনো প্রবণতাও তাঁদের পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়, এমন কি 'আধ্যাত্মিক গবেষণা' কিংবা 'শারীর-মনোবিজ্ঞান মন্দিরে' পরীক্ষা-নিরীক্ষার খাতিরেও নয়। কিন্তু সে যাক, কথাটা এই যে এই সন্ন্যাসীদের কোনো একজনের ধর্মশিক্ষা বা উপদেশাবলী ভালো ক'রে জানা সকলের পক্ষে অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। 'সকলের পক্ষে' অর্থে আমি সেই সব রাজনীতিবিদ মহাশয়দের কথা বলছি ভারতীয় সমাজের বিচিত্র শ্রেণীর লোকদের নিয়ে যাদের প্রাত্যহিক কারবার—কিংবা সেই সব মিশনারিবৃন্দ, ভারতীয়দের বুঝে নিয়ে তাদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগে যারা অত্যন্ত ব্যগ্র, অথবা ধর্ম ও দর্শনের সেই সব ছাত্ররা যাদের জানা উচিত সাম্প্রতিক কালে কী ভাবে ঈশ্বরানুগত ভক্তরা পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শনশাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত বেদান্ত দর্শনের শিক্ষা

ছুন, জানা উচিত বেদান্তের দুর্দান্ত প্রভাব শুধু কতিপয় দার্শনিক নয় ... দার্শনিকের দেশ সমগ্র ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের উপর ... ভাবে কাজ ক'রে চলেছে। যে-দেশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এমন মহৎ ...ধারা বর্তমান, রামকৃষ্ণের বাণীতে যার প্রকাশ, তেমন দেশ সম্ভবত ... পৌত্তলিকের দেশ বলে গণ্য হতে পারে না। মধ্য আফ্রিকার ...কদের মতো এ-দেশের লোকদের একই পদ্ধতিতে ধর্মান্তরিত করাও ... না।

রামকৃষ্ণ-বাণীর পশ্চাৎপটে আছে বেদান্ত দর্শন, সুতরাং উক্ত দর্শনের ...াত বৈশিষ্ট্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা যোজনার কথা আমার মনে ...ছিল। এই সংযোজনটি বাদ দিলে রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যবর্গের ...দর্শ কী তা হৃদয়ঙ্গম করা বহু পাঠকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য হবে।

রামকৃষ্ণ-বাণীর কোনো-কোনোটি আমাদের কানে যে অদ্ভুত, এমন কি ...ীয়, বলে মনে হ'তে পারে সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সজাগ। তেমনি ...া ভগবতীরূপে ঈশ্বরের ধ্যানধারণার কথা শুনলে আমরা চমকে উঠি। ... এ-বিষয়ে রামকৃষ্ণের ধারণার সত্যকার তাৎপর্য কী তা আমরা তাঁর ... থেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি :

'মা বলতে ভক্ত এত মত্ত হন কেন? মার কাছে যে আব্দার বেশি। সন্তানের কাছে মা আর মায়ের কাছে সন্তান যত প্রিয় যত আপন যত নিঃসংকোচ এমন আর-কেউ না, কোথাও না।'

এই হিন্দু ভক্তরা মাঝে-মাঝে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এমন ভাষায় কথা বলেন ...আমাদের কাছে নিতান্ত আটপৌরে এমন কি অশ্রদ্ধেয় বলে মনে হয়। ...ষয়ে হয়তো তাঁরা নিজেরা সচেতন এবং তার জন্য তাঁদের বলতে হয় :

'যে খাঁটি ভক্ত দিব্যপ্রেমের অমৃত আকণ্ঠ পান করেছে সে তো খাঁটি মাতালের তুল্য, আর সেই জন্যেই তো বিহিত নিয়ম-কানুন মেনে চলা তার পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না।'

অথবা :—

'সাধকের বল কী? ছেলেদের মতো সাধকের কান্নাই বল।'

যদি আমাদের মনে না-থাকে যে অন্দরমহলের—অর্থাৎ অন্ত মহলের—আসল মানে হচ্ছে একটি সুরক্ষিত পবিত্র স্থান তাহ'লে নিম্নোদ্ধৃত বাণীটি নিশ্চয়ই আমাদের কানে লাগবে :

'জ্ঞান—পুরুষ। ভক্তি—স্ত্রীলোক। ঈশ্বরের বাহির বাটীতে জ্ঞা যেতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুরে ভক্তি ছাড়া আর-কেউ যেতে পারে না

পরবর্তী বাণীতে আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বরের জ্ঞান-ভক্তির ব গভীর রহস্য প্রত্যক্ষ করেছেন রামকৃষ্ণ :

'ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঈশ্বরের ভক্তি শেষ পর্যন্ত অভিন্ন। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি একই।'

পরবর্তী বাণীগুলিতে তাঁর গগনচুম্বী প্রত্যয়ের প্রকাশ :

'একবার ডাক দেখি মন ডাকার মতন
কেমন শ্যামা থাকতে পারে।

'যার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে তার ঈশ্বর দর্শন হবেই হবে।'

'যার বিশ্বাস আছে, তার সব আছে। যার বিশ্বাস নেই তার কিছুই নেই।'

'শিশুর মতো সরল না-হ'লে দিব্যজ্ঞান হয়না। বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে শিশুর মতো অবোধ হও তো সত্যকে পাবে।'

'সাধকের বল কোথায়? সাধকের বল তার চোখের জলে। নাছোড়বান্দা সন্তানের কান্না শুনে মা যেমন তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তেমনি যে-সাধক সরল শিশুর মতো ব্যাকুল অন্তরে কাঁদেন তাকে ভগবান দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না।'

'তেল ছাড়া দীপ জ্বলে না, ঈশ্বর ছাড়া মানুষ বাঁচে না।'

'ঈশ্বর সকলকার ভেতর আছেন, কিন্তু সকলে তাঁর ভেতর নেই, এ-জন্যই লোকের এত দুঃখ।'

এই সকল বাণীতে আমরা এই কথাটা জানতে পাই যে ভারতব মতো পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবাত্মা ও মানবপ্রকৃতিতে ঐশী সত্ত উপস্থিতি এমন তীব্র ও বিশ্বজনীনরূপে অনুভূত হয় নি। ঈশ্বরের প্র

প্রগাঢ় ভক্তি ও ভগবানের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ অবলুপ্তির অনুভূতিটিও রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত স্বতঃস্ফূর্ত বাণীর মতো আর-কোথাও এমন প্রবল-রূপে প্রকাশিত হয়নি। এতৎসত্ত্বেও, মানবপ্রকৃতির সঙ্গে ঐশীপ্রকৃতির বিচ্ছেদ কী কী প্রতিবন্ধকের ফলশ্রুতি তাও তিনি নির্ভুল জানতেন।

রামকৃষ্ণের উচ্চারিত বাণীতে কেবল তাঁর নিজের মনন-চিন্তন নয়, পরন্তু কোটি কোটি মানুষের আশা ও বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত হয়েছে, এ-কথা স্মরণ রাখলে আমরা বাস্তবিকই ঐ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হতে পারি। মানুষের মধ্যে ঐশী চেতনা ঐ দেশে আছে, সকলেই স-চেতনার অংশভাগী, যতই কেননা পৌত্তলিক হোক তারা। ঐশী সত্তার স্থায়ী অনুভূতি বাস্তবিক পক্ষে এমন একটি সাধারণ ভিত্তি যার উপর, আমরা আশা করতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে আগামী দিনের মহান মন্দির গড়ে উঠবে। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় যুক্ত ক'রে হাতে হাত মিলিয়ে হিন্দু-অহিন্দু সর্ব জাতির মানুষ এই মন্দিরে এসে সর্বশক্তিমান সেই পরম পুরুষের উপাসনা করবে যিনি আমাদের সকলের অন্তরে বিরাজমান; তিনি আছেন বলেই আমাদের জীবন, আমাদের সকল কর্মকাণ্ড ও সমস্ত অস্তিত্ব অর্থান্বিত।

এফ. ম্যাক্সমুলার

॥ মহাত্মা প্রসঙ্গ ॥

কিছুকাল যাবৎ আমি ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক কালের কোনো-কোনো ধর্মান্দোলন বিষয়ে কিছু বলবার তাগিদ অনুভব করছি। এ-সকল বিষয়ে আমাদের দেশে অনেক ভুল তথ্য ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার ধারণা। ভারতবর্ষের প্রাচীন কিংবা আধুনিক ধর্মীয় অবস্থার সঙ্গে যাদের কোনো পরিচয় নেই—যে-দেশকে প্রায়শ এবং ন্যায়সঙ্গতরূপে বলা হয় দার্শনিকের দেশ, সেই দেশের প্রচলিত দার্শনিক ভাবধারা সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, তাদের পক্ষে এই আন্দোলনগুলি উপলব্ধি করা ভারি শক্ত, আরো বেশি শক্ত বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের স্বাতন্ত্র্য চিনে নেওয়া। এই ধর্মীয় নেতারা এবং তাঁদের প্রবর্তিত মতবাদগুলি সমালোচনার যোগ্য। স্ব-স্ব মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে এই নেতারা প্রায়শ তা লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে অত্যন্ত বাগ্মিতার সঙ্গে প্রচার করেন। লক্ষ লক্ষ লোক তা বিশ্বাস করে, মেনে চলে। 'একজন প্রকৃত মহাত্মা' নামে আমার প্রবন্ধটি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে 'নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরি' কাগজের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পর ভারতবর্ষে ও ইংল্যাণ্ডে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। উক্ত প্রবন্ধে আমার বক্তব্য ছিল দ্বিবিধ : ইদানীং যে-সকল সাধু-সন্ত ভারতবর্ষে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন তাঁদের সম্পর্কে যে-সব অদ্ভুত ও অতিরঞ্জিত বিবরণ ভারতীয়, মার্কিন ও বৃটিশ পত্র-

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল আমার প্রথম অভিপ্রায় ছিল তার প্রতিবাদ করা। সেইসঙ্গে আমার দ্বিতীয় অভিপ্রায় ছিল এই তথ্যটি উপস্থাপন করা যে, 'ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা', 'অতি নিগূঢ় বৌদ্ধধর্ম' প্রভৃতি অদ্ভুত-অদ্ভুত নামের অন্তরালে সেখানে এমন-কিছু আছে যা সত্য, যা জানবার যোগ্য, এমন কি ইউরোপে আমরা যারা প্লেটো, আরিস্তোতল, কাণ্ট ও হেগেলের উত্তরসূরী, আমাদের পক্ষেও তা-ই। এটা প্রায়শই দেখা যায় যে, লোকের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার ক্ষমতার চেয়ে প্রশস্তির ক্ষমতা ঢের বেশি, কোনো-কোনো হিন্দু সাধু-সন্তের গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও তা-ই দেখা গেছে। তাঁদের ধারণা, এইসব ভারতীয় মহাত্মাদের প্রথম আবিষ্কার ক'রে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন তাঁরা ;—শুধু যে তাঁরা অতি প্রাচীন এমন কি আদি প্রজ্ঞার গহনলোকের ভাণ্ডারী বলে এই মহাত্মাদের গণ্য করেছেন তা-ই নয়, পরন্তু অতি বাজে মার্কা তুকতাক ভেল্কিবাজির ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে মহাত্মাদের অতিমানবিক শক্তিধর বলে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। এই সব মহাত্মাদের অং-বং-এর চাতুরি, যা বহুপূর্বে প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রের কাছেই পরিষ্কার ছিল, উক্ত সাধু-ভক্তরা তা জানতেন না। তাঁরা এই ধারণা নিয়ে ভেসে যেতেন যে, তাঁরা ভারতবর্ষে মানবজাতির এক নূতন ধারা প্রত্যক্ষ করলেন। এই 'নূতন ধারা' অর্থাৎ উপরোক্ত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা নানাবিধ কঠোর ও ভয়াবহ ব্রত-নিয়ম পালন, সংযত জীবনযাপন, প্রগলভ ও চমকপ্রদ বাণীবিতরণ এবং অপূর্ব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে উচ্চ-নীচ সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করতেন। বহুদিন ধ'রে এই সন্ন্যাসীরা নানা নামে পরিচিত, 'মহাত্মা' তার অন্যতম। মহামতি, উচ্চমনা, উন্নত চরিত্র, উদারচেতা—'মহাত্মা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনেক। এই শব্দটি প্রায়শ শ্রদ্ধাসূচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আমরা যেমন 'রেভারেণ্ড' বা 'অনারেব্‌ল' শব্দ ব্যবহার করি। এটা টেকনিক্যাল শব্দ হিসেবেও স্বীকৃত। প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় যাঁরা 'সন্ন্যাসী' বলে পরিচিত সেই

শ্রেণীর ব্যক্তিদের 'মহাত্মা' নামে অভিহিত করা হয়। সংসারের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে জাগতিক সমস্ত কিছু যিনি ত্যাগ করেছেন আক্ষরিক অর্থে তিনিই 'সন্ন্যাসী'। ভগবদ্গীতায় আছে: "যিনি প্রেম-ও ঘৃণারহিত, সর্ব বিষয়ে যিনি নিরাসক্ত, তিনিই সন্ন্যাসী।" *

* গীতা: ৫ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোকে উল্লিখিত:
"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"

জীবনের চার পর্যায়

মনুসংহিতার পরিপ্রেক্ষিতে*ব্রাহ্মণের জীবন চারটি পর্যায় বা 'আশ্রমে' বিভক্ত : ছাত্র বা 'ব্রহ্মচারী', সংসারী বা 'গৃহস্থ' সন্ন্যাস বা 'বানপ্রস্থ' এবং ঋষি বা 'যতি'। প্রথম দুটি পর্যায় বেশ পরিষ্কার : ছাত্রজীবনের পর দাম্পত্যজীবন। অধ্যয়ন, পবিত্রতা, গুরুজনের আজ্ঞা পালনে বাধ্যতা প্রভৃতি কতকগুলো কঠিন নিয়মে প্রথম পর্যায়টি নিয়ন্ত্রিত। বিবাহিত পুরুষের সমস্ত কর্তব্য, নিজের ও অপরের জন্য নানাবিধ কর্ম-সম্পাদন দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের সন্ন্যাস ও 'যতি'র নাম দুটি প্রায় সমার্থক, কর্ম অনুযায়ী নাম দুটির পার্থক্য বোঝা যায়। কিন্তু এ-দুইয়ের প্রধান পার্থক্য মনে হয় এই রকম : তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ সন্ন্যাস বা বানপ্রস্থ অবস্থায় ব্রাহ্মণ তাঁর গ্রামের বসতবাটি ছেড়ে অরণ্যে গিয়ে, এমন কি পুত্র-কলত্র সমভিব্যাহারে, বসবাস করেন ; সেখানে সন্তান-সন্ততির দেখাশুনা করা, ধুনি জ্বালিয়ে পূতাগ্নি রক্ষা করা, পবিত্র শাস্ত্রানুযায়ী সর্বক্ষণ কিছু যোগাভ্যাস করা প্রভৃতি তাঁর নিত্যকর্ম। জীবনের শেষ পর্যায় অর্থাৎ 'যতি'র ক্ষেত্রে তিনি সমস্ত বিধিবিধান থেকে মুক্ত হয়ে একক ও নিঃসঙ্গ দিনযাপন করেন, নির্দিষ্ট বাসস্থানও তাঁর থাকে না। ঋষি বা যতিকে কোনো-কোনো শাস্ত্র-অনুবাদক তৃতীয় পর্যায় এবং সন্ন্যাস বা বানপ্রস্থকে চতুর্থ পর্যায় হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। সংস্কৃত পুরাণেও এই দুই পর্যায়ের বিভিন্ন নাম রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ের স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কার। তৃতীয় পর্যায়টি শুধু সংসারের দিকে পিঠ ফেরানো, কিন্তু চতুর্থটি সংসারের যাবতীয় স্বার্থ, কর্ম ও কৃত্য থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে

* মনু : ৬ অধ্যায়, ৮৭ শ্লোক

বাসনা-কামনার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অনিকেত জীবনযাপন। সুতরাং অংশত তৃতীয়, অংশত চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ভুক্ত বলে ইদানীং কালের মহাত্মাদের গণ্য করা সমীচীন। যাকে আমরা বলে থাকি 'মঠাশ্রয়ী' বা ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী এঁরা আসলে তা-ই, কেননা ভিক্ষা ও উঞ্ছবৃত্তি এঁদের সর্বস্বীকৃত অধিকার।

এই সন্ন্যাসীদের আরেক নাম 'অবধূত', যার আক্ষরিক অর্থ নিরাসক্ত, যদিও সাধারণ্যে এঁরা কেবল 'সাধু' বা সজ্জন বলে পরিচিত।

ভারতবর্ষে বর্তমানে কোনো সন্ন্যাসী আছেন এ কথা মাঝে মাঝে অস্বীকার করা হয় এবং, এক হিসেবে, এই অস্বীকৃতি অমূলক নয়। মনুসংহিতায় উল্লেখিত চার পর্যায়ভুক্ত জীবনের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি অল্পবিস্তর সর্ব যুগের আদর্শ ছিল বলে প্রতিভাত হয়। উচ্চাভিলাষী সৎ ব্রাহ্মণদের পক্ষে এইরূপ জীবনাদর্শ থাকাই সংগত। কিন্তু মানব প্রকৃতির বিচার করলে সমগ্র ভারতবর্ষে এ-আদর্শের অনুসরণ সম্ভবপরতার পরপারে ছিল বলেই মনে হয়। সে যাই হোক, বর্তমানে যদিও ভারতবর্ষে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজেদের সন্ন্যাসী বলে জাহির করেন, দেশের লোকেরাও তাঁদের 'সাধু' বলে অভিহিত করে থাকে, কিন্তু মনু যেমন বলে গেছেন তাঁরা তা মোটেও নন। তাঁরা আর ছাত্রাবস্থার কঠোর নিয়ম-শৃংখলার ধার ধারেন না, বিবাহিত জীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য পালনের কোনো প্রয়োজন নেই তাঁদের, বহুবর্ষব্যাপী অরণ্যবাসের নিঃসঙ্গতারও না। জীবনের যে-কোন সময়ে সমস্ত অনুশাসন, প্রয়োজন হলে অঙ্গের বসন-ভূষণও ছুঁড়ে ফেলে দিতে তাঁদের আটকায় না, শ্রোতা পেলে যখন-খুশি যেখানে-খুশি তাঁরা বাণীবিতরণ স্নুরু করে দেন।

মনুসংহিতায় যে-বিধান দেওয়া আছে তা যে প্রথম প্রথম অমান্য করা হতো সে-কথা আমরা জানতে পাই 'ব্রাত্য' বলে একটা গোটা সমাজের অস্তিত্ব থেকে। সুদূর ব্রাহ্মণ্যযুগে ফিরে গেলে এই ব্রাত্যদের বিষয়ে আমরা অনেক কথাই জানতে পাই : এরা সমাজে ছিল পতিত, ব্রহ্মচর্য বা

ছাত্রাবস্থার যথাবিহিত রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত ছিল না, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে এরা উচ্চতর তিন বর্ণের সুযোগ-সুবিধার অধিকার লাভ করতো।* এই ব্রাত্যরা যে মূলত অনার্য ছিল সে-কথা দৃঢ়স্বরে বারংবার বলা হয়েছে, কিন্তু কখনো প্রমাণ করা যায়নি। ব্রাহ্মণ্য-যুগে 'ব্রাত্য' শব্দটি বিশেষ অর্থে আর্যদের উপর প্রযুক্ত হয়েছিল—সেই সব আর্যদের উপর যাঁরা প্রথমত বিশেষ বর্ণ হিসেবে মাননীয় ছিলেন, ব্রহ্মচর্যের প্রথম সোপানের কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্য পরে যাঁরা বর্ণাধিকার থেকে চ্যুত হ'লেন। আসলে ব্রাত্যদের শ্রেণী ছিল তিন, ব্যক্তিগতভাবে অথবা পুরুষানুক্রমিক হৃত-অধিকারের চরিত্র অনুযায়ী তারা এক-এক শ্রেণীভুক্ত হতো। এই তিন শ্রেণীর ব্রাত্যরা নির্দিষ্ট কোনো-কোনো যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করতে পারতো। আধুনিক ভাষায় অবশ্য 'ব্রাত্য' বলতে 'দুষ্ট' বা 'অদমনীয়' ছাড়া বেশি-কিছু বোঝায় না।

বৌদ্ধ আন্দোলনের মূল কথাটা লক্ষ্য করলে কৌতূহল জাগ্রত হয়: জীবনের তৃতীয়, বিশেষত চতুর্থ পর্যায়ে প্রাপ্তব্য বন্ধনমুক্তি বা 'আধ্যাত্মিক মোক্ষ' যদি মর্ত্যজীবনের চরম লক্ষ্য হয় তবে তার জন্য মৃত্যু অবধি অপেক্ষা করা ভুল—এই তো ছিল তর্ক। এক হিসেবে বৌদ্ধরা ছিলেন ব্রাত্য, শিক্ষার্থীর সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিকর নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলতে তাঁরা অস্বীকার করলেন, বিবাহ ও অন্তহীন যাগযজ্ঞ সম্বলিত গৃহস্থের নিত্যকৃত্য তাঁদের কাছে মনে হলো শুধু নিস্ফল নয়, ক্ষতিকরও। বুদ্ধদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীদের জন্য নির্দিষ্ট কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ব্রাহ্মণ সমাজের নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত বাসনা-কামনার ঊর্ধ্বে পরম মোক্ষলাভ যাঁদের কাম্য এই ধরণের কৃচ্ছ্রসাধন তাঁদের সহায়ক না-হ'য়ে বাধাস্বরূপ হ'য়ে থাকে। প্রায় প্রথম যুগের বৌদ্ধদের মধ্যে অবশ্য এটা দেখা যায় যে তাঁদের সংঘের সদস্যদের রীতি অনুযায়ী 'ভিক্ষু'—অর্থাৎ ভিক্ষাজীবী—নাম গ্রহণ ক'রে এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণদের

* বোম্বের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের ভল্যুম ১৯, পৃষ্ঠা ৩৫৮ দ্রষ্টব্য।

নীতি ও আদর্শ অবশ্য-পালনীয় বলে মেনে নিয়ে তাঁরা নিজেদের সন্ন্যাসী বলে জাহির করতেন, যদিও বেদ তাঁরা মানতেন না এবং পুরুষানুক্রমিক অনুশাসন ও ব্রাহ্মণদের সকল প্রকার যাগযজ্ঞাদি নিছক অন্তঃসারশূন্য ও আত্মার অশান্তি বলে পরিহার করতেন।

॥ সন্ত বা সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ ॥

যে-জীবনাদর্শের কথা বলা হ'লো তা বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্বে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল। তাঁদের মধ্যে এমন অনেক ছিলেন যাঁরা সমাজের সমস্ত নিগড় ভেঙে, ঘর-সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে বা গুহায় গিয়ে বাস করতেন। সর্বপ্রকার শারীরিক ভোগ-সুখ তাঁরা পরিহার ক'রে চলতেন, নামমাত্র পানাহার করতেন এবং প্রায়শ এমন সব আত্মনিগ্রহ ভোগ করতেন বহু বিচিত্র চিত্রে এবং আধুনিক কালের প্রত্যয়যোগ্য আলোকচিত্রে যার নিদর্শন দেখে আমরা আঁতকে উঠি। স্বভাবতই একটা স্নিগ্ধ, পবিত্র ভাস্বরতা এঁদের ঘিরে থাকতো। উপকারী উপদেশ সংগ্রহে যে-সকল দর্শক বা শ্রোতা আসতো তাঁদের কাছ থেকে এঁরা নিতান্ত প্রয়োজনানুরূপ যৎসামান্য গ্রহণ করতেন। সকলে না-হ'লেও এই সন্তদের মধ্যে কেউ-কেউ অবশ্যই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন তাঁরা। কেউ-কেউ আবার, বিস্ময়ের কারণ নেই, ভণ্ড ও প্রতারকরূপেও দেখা দিত, গোটা সন্ত সমাজের কলঙ্ক ছিল এরা। আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে, পূর্বে শিক্ষার্থীজীবন ও গার্হস্থ্যজীবনের বহুবর্ষব্যাপী কঠোর ও নিটুট নিয়ম-শৃংখলার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সন্ন্যাসীর পদমর্যাদা যুক্ত ছিল।

এইরূপ কঠোর নিয়ম-শৃংখলা সুনিয়ন্ত্রিত মন গঠনের নিশ্চিত সোপানরূপে এবং, তথাকথিত সন্তদের জীবনেও যা সচরাচর দেখা যায়, সেই আত্মরতিতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবেও গৃহীত হয়েছিল। যখন এই রক্ষাকবচটি অপসৃত হয় এবং যখন জীবনের যে-কোনো সময়ে জনৈক ব্যক্তি সন্ন্যাসী বলে আত্মঘোষণা করে, তখন একজন সন্তের পক্ষেও প্রলোভন প্রবলরূপে দেখা দেয়। এতৎসত্ত্বেও,

কোনো সন্দেহ নেই, খাঁটি সন্ন্যাসী পুরাকালেও ছিলেন, এখনো আছেন। পুর শৃংখল চূর্ণ ক'রে কঠিন নিয়মনিষ্ঠায় শরীর গঠন করেছেন এঁরা, চিত্র কল্পনাকে শাসন ক'রে মনকে উন্নীত করেছেন এমন এক স্তরে যা বিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর। নিয়মিত যোগাভ্যাস করেন বলে এঁদের বলা য় যোগী।

যোগাভ্যাস

বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে 'যোগ' হ'লো এক আশ্চর্য নিয়ম-শৃংখলা, এবং এক হিসেবে আমাদের সকলেরই যোগী হওয়া উচিত। প্রায়োগিক অর্থে যোগ মানে প্রয়োগ, মনঃসংযোগ, প্রযত্ন;—এর মৌল অর্থে যে ভগবানের সঙ্গে মিলনের ভাবটি ছিল তা বহুকাল পরিত্যক্ত হ'য়েছে। এই যোগ পরে একটি কৃত্রিম প্রণালীতে বিস্তারলাভ করেছিল: কিছু-কিছু ক্রিয়াকলাপ দর্শনের সহায়করূপে থেকে যোগ ক্রমশ একটি সর্বাঙ্গীণ দর্শন-প্রণালীতে সম্প্রসারিত হ'লো। এইরূপে পতঞ্জলির যোগদর্শনে কপিলের সাংখ্য দর্শনের বৈচিত্র্য দেখা গেল। ব্রহ্মবাদীতে (পৃঃ ৫১১) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দর বিবরণ থেকে জানা যায়, বর্তমান যুগে চার প্রকারের যোগাভ্যাস চলছে: মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ এবং হঠযোগ। একটি বিশেষ শব্দ, কোনো নির্দিষ্ট দেবতার সংকেতবহ একটি মন্ত্র, বারংবার আবৃত্তি ও তাতে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করার রীতি মন্ত্র-যোগের অন্তর্গত। লয়যোগে আমাদের সমস্ত চিন্তা ও মনন কোনো একটি বিষয়ে অথবা বিষয়ের ভাবে এমন সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করতে হবে যাতে আমরা উক্ত বিষয়ে প্রায় একাত্ম হ'তে পারি। ভগবানে বিলীন হবার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ব্যবস্থা দেবতার সংকেতবহ নামজপ অথবা দেবতার কল্পিত প্রতিরূপ। মনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে রাজযোগে। লক্ষ্য ক'রে দেখা গেছে যে কোনো একটা নতুন জিনিসের প্রতি সহসা আমাদের মনঃসংযোগ করতে গেলে আমরা শ্বাস রুদ্ধ করি। সুতরাং এ থেকে ধারণা করা হ'য়েছিল যে, মনঃসংযোগের ব্যাপারে শ্বাসরোধের—অর্থাৎ প্রাণায়ামের—প্রয়োজন রয়েছে। শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে হঠযোগের সম্বন্ধ। এই যোগ শরীরের কোনো-

কোনো প্রত্যঙ্গের দ্বারা মনঃসংযোগ ঘটায়। যেমন কোনো বিন্দুতে, বিশেষত নাসিকার অগ্রভাগে, চোখের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখা এবং এইরূপ নানান কলা-কৌশল হঠযোগের অন্তর্গত। এ-সবের বিস্তৃত বিবরণ আছে যোগসূত্রে। যোগসূত্র মানুষকে সর্বাঙ্গীণ সৎ হবার ধারণা দেয়। সন্দেহ নেই, যে-সকল বিষয়ে প্রাচীন কালের যোগীরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার সমস্তটা বিশ্বাস করা কঠিন, আধুনিক কালের যোগীদের কৃতিত্বও প্রায়শ বড়ো চমকপ্রদ। স্বীকার করছি, এই সব যোগীদের বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস না-করা আমার পক্ষে একই রকম শক্ত। বিশ্বস্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাদের বলে থাকেন যে, এই সব যোগীরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনশনে থাকেন, বহুকাল ব্যাপী তাঁরা একাসনে স্থিরভাবে বসে থাকতে পারেন, কোনো যন্ত্রণা অনুভব করেন না, চোখের দৃষ্টিতে সম্মোহিত করা ও মানুষের মনের চিন্তা-ভাবনার খবর বলে দেওয়া তাঁদের আয়ত্তে। আমি এই সব বিশ্বাস করি। কিন্তু সেই একই প্রত্যক্ষদর্শীরা যখন বলেন যে, আকাশে ভ্রাম্যমাণ দেব-দেবীর আকৃতি যোগীরা দেখতে পান, অথবা কল্পিত ঈশ্বর স্বয়ং তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তাঁরা আকাশবাণী শোনেন, স্বর্গীয় সৌরভ উপভোগ করেন এবং তাঁদের বায়ুভূত নিরালম্ব অবস্থায় বসে থাকতে দেখা যায়, তখন আমি অবশ্যই সন্ত টমাসের অধিকার একটু বেশী মাত্রায় দাবি করি—যদিও আমি বলতে বাধ্য যে, শেষোক্ত বিষয়ে যে-সকল প্রমাণ আমি পেয়েছি তা অতীব বিস্ময়কর।*

মূর্ছা বা সমাধির অবস্থা যে-সকল নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে ভারতীয় যোগীরা ঘটাতে পারেন তা যে চিকিৎসাবিদ্যা ও মনোবিদ্যা সম্মত এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। এবং যদিও ভারতীয় যোগীদের মধ্যে নিশ্চতরূপে অনেক প্রতারক আছে তথাপি আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন ভারতীয় যোগীদের সবাইকে আমরা প্রতারক হিসেবে না-ঠাওরাই। ঈশ্বর-অনু-প্রাণিত বলে যাঁদের বিশ্বাস করা হয় তাঁদের কাছে তাঁরা যা নন তা-ই

* এইচ. ওঅলটর রচিত 'হঠযোগ প্রদীপিকা' গ্রন্থ, ১৮৯৩, দ্রষ্টব্য।

২

ভান করবার প্রলোভনটা নিঃসংশয়রূপে প্রবল হয়ে ওঠে; শুধু ভান-ভনিতা নয়, তাঁদের প্রতি অন্যের যে-বিশ্বাস তাঁরা স্বয়ং সেই বিশ্বাসেই মজেন। এবং যদি তাঁরা একটা দার্শনিক আবহাওয়ায় গড়ে ওঠেন, অথবা গভীর ধর্মভাবে পূর্ণ হন, তবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা লক্ষণ মিলিয়ে এক-একজন মহাত্মারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এইসব ব্যক্তিরা হৈ-হৈ কাব্যে, উত্তপ্ত বক্তৃতায় যেমন আপনাদের উজাড় করে দিতে পারেন, তেমনি আবার দার্শনিক সমস্যাকীর্ণ সূক্ষ্ম আলোচনায় যোগ দিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দেবার যোগ্যতাও দেখিয়ে থাকেন।

রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ এমন একজন ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় প্রভূত
্যাতি অর্জন করেছেন। সেখানে তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁর ধর্মমত প্রচারে তৎপর
্বং খৃষ্টান শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য থেকেও তাঁর ধর্মমতান্তরিত ব্যক্তিদের সংগ্রহে
্ক্রিয়। এটা আমাদের কাছে ভারি অদ্ভুত, এমন কি প্রায় অবিশ্বাস্য বলে
্নে হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, অসংখ্য লোকের ধর্ম যে-খৃষ্টধর্ম
্তার অন্তর্নিহিত সম্পদ কী, এবং সেই সব অসংখ্য লোক যারা নিজেদের
্ষ্টান বলেন অথচ মানুষের ইতিহাসে খৃষ্টের স্থান কোথায়, প্রকৃতপক্ষে
্তিনি কী শিক্ষা দিয়ে গেছেন, এ-সব বিষয়ে যাদের কোনো ধারণাই
্নেই। এমন অনেক আছেন যারা খৃষ্টধর্মের ইতিহাস বা তার মতবাদ
্সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানেন না, কিংবা যদি বা জানেন, সেটা তারা
্স্রেফ প্রশ্নোত্তরমালা মুখস্থ ক'রে জেনেছেন। যা শিখেছেন তা-ই
্তারা বারংবার তোতাপাখির মত আওড়ান; সত্যিকারের প্রেম বা
্বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র বালাই নেই কোথাও। তথাপি এ-কথা সত্য যে,
প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ধর্মের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে, আছে
্দুরন্ত ক্ষুধা, যা চরিতার্থতায় উন্মুখ। এখন, রামকৃষ্ণের শিষ্যবর্গ যে-
্ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন তা অবাধে এই ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের স্পর্শ করে।
্যে-ধর্মমত গ্রহণে কোনো চাপ কিংবা কোনো জবরদস্তি নেই, এই ব্যক্তিদের
কাছে প্রথমে সে-ধর্মকে মনে হয় নিছক পৌত্তলিকের ধর্ম, নিতান্ত
অবজ্ঞেয়। যদি নেহাৎ তারা এই ধর্মের মতবাদ শোনেন, সেটা সম্পূর্ণ
তাদের ইচ্ছাধীন, শুনতে পারেন, না-ও পারেন। যদি এর কোনো
অংশও তারা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন সেটাও তাদের স্বাধীন
রুচির উপর নির্ভরশীল। যে-ধর্ম রুচি-বুদ্ধির মনোনীত ধর্ম তার শক্তি

সর্বদা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধর্মের চেয়ে অধিকতর। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, নবলব্ধ বিশ্বাসের প্রতি ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের উৎসাহ কী প্রচণ্ড। আর তাঁরা, ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য যাঁরা কখনো জানেন নি, সত্যের কণামাত্র নিদর্শন পেলে তাঁরা সোচ্চারে বলে থাকেন যে, তাঁরাই তার আবিষ্কর্তা, এবং সেই সত্যেই অতঃপর তাঁদের স্বচ্ছন্দ বিহার। এই হেতু যদিও রামকৃষ্ণের ধর্মমত গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখিত লোক-সংখ্যায় কিছু অতিরঞ্জন থাকতে পারে এবং যদিও বেদান্তবাদী হয়েছেন বলে যাঁরা বলছেন তাঁদের মধ্যে কারো-কারো হয়তো আসলে প্রকৃত খৃষ্টধর্মে প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে, তবু এ-বিষয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে না যে, যে-ধর্ম আমাদের কালে এমন আশ্চর্য সফলতা অর্জন করেছে, যে ধর্ম বেদের চূড়ান্ত* বা শেষ পর্যায়রূপে বেদান্তকে আশ্রয় ক'রে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম ও দর্শন হিসেবে সত্যরূপে পরিগণিত তা আমাদের সতর্ক অভিনিবেশযোগ্য।

নূতন ধর্মের প্রবর্তক বলে রামকৃষ্ণ নিজে কখনো দাবি করেন নি। তিনি কেবল ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মের প্রচার করেছেন : এই ধর্ম বেদের উপর, বিশেষত উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—পরে বাদরায়ণের সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত শঙ্কর ও অন্যান্য মহামনীষীদের ভাষ্যে বিকাশ লাভ করে। এই ধর্মপ্রচার ও নির্জনবাস করেও রামকৃষ্ণ নিজেকে আদৌ অনন্য বলে মনে করেন নি। রামকৃষ্ণের সমসাময়িক ভারতবর্ষে পরমহংস নামে অভিহিত মুখ্য বেদান্ত-প্রচারক ছিলেন অনেক। এঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ধর্তব্য নন, কেননা—যদিও তিনি ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় সুপরিচিত, মহান ধর্ম-সংস্কারক ছিলেন, খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর

* এই হলো 'বেদান্ত' নামকরণের ব্যাখ্যা। কিন্তু এটা সম্ভবত পশ্চাৎ-চিন্তা। 'সিদ্ধান্ত', 'সূত্রান্ত' প্রভৃতি অন্ত-বিশিষ্ট নানা যৌগিক শব্দের মতো প্রথমে এই শব্দটির অর্থ হয়তো বেদের বিষয়-বস্তুর অধিক কিছু ছিল না। তারপর, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের শেষ পর্যায়ের মতো এও হয়তো বেদের শেষ সোপানরূপে পরিগণিত হয়েছিল। শেষ সোপান, অর্থাৎ বেদের চূড়ান্ত রূপ বা শেষ লক্ষ্য।

বিষম প্রবণতাও ছিল—সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়মনিষ্ঠার জীবন তিনি যাপন করেন নি। কিন্তু কেশবচন্দ্র তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে ঐ উপাধির উপযুক্ত চারজনের নাম উল্লেখ করেছেন: প্রথমতঃ দয়ানন্দ সরস্বতী, যিনি দুর্ভাগ্যবশত কোনো এক সময়ে মাদাম ব্লাভাৎস্কির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ; দ্বিতীয়ত গাজিপুরের পাওহারি বাবা ; তৃতীয়ত ডুমরাওয়ের শিখ নাগাজী ; এবং সর্বশেষ আমাদের রামকৃষ্ণ--সাধারণ্যে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস বলে পরিচিত। "এঁরা", কেশবচন্দ্র বললেন, "চারজন যোগী-পুরুষ, আমাদের বন্ধুরা যাঁদের সময়ে-সময়ে শ্রদ্ধা জানান এবং যাঁদের সান্নিধ্যে এসে তাঁরা পূত চরিত্র ও দৃষ্টান্তের শক্তি সন্ধান করেন। প্রত্যেক যোগী ও সন্তকে, ভগবৎকৃপায় যদি আমরা তাঁদের সান্নিধ্যে আসি, প্রগাঢ় ভক্তি ও বিনয়াবনত চিত্তে যেন আমরা সেবা করতে পারি। সাধুসঙ্গে"—কেশবচন্দ্র শেষ করলেন—"অপবিত্র মন পবিত্র হয়।"

দয়ানন্দ সরস্বতী

কেশবচন্দ্র-উল্লিখিত প্রথম সন্ত দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আমরা জেনেছি। হিন্দুধর্মের বৃহৎ সংস্কারের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তিনি এবং সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে উদারচেতা ছিলেন। ব্রাহ্মণের দৈবী সত্যের উদ্ঘাটনে তিনি তাঁর বিশ্বাস বলি দিতেও রাজি ছিলেন, যদিও বৈদিক স্তবগানের জন্য তিনি তা পূর্ণ শক্তিতে রক্ষা করেছিলেন। বেদের যে-বৃহদাকার টীকা-ভাষ্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাতেই তাঁর পঠন-পাঠনের বিস্তৃতি ও সংস্কৃতে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি হৃদয়ঙ্গম হয়—যদিও একই সঙ্গে তাঁর সূক্ষ্ম বিচারবোধের নিদারুণ অভাবও ধরা পড়ে। বিধবার পুর্ণর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ রহিত প্রভৃতি আন্দোলন তিনি সমর্থন করেছিলেন। মুক্ত পৌত্তলিকতা, এমন কি বহু-ঈশ্বরবাদকেও তিনি নিন্দা করেছেন। যখন থেকে মাদাম ব্লাভাৎস্কির ফাঁদে তিনি পা দিলেন তখন থেকেই ইওরোপে তাঁর নাম বেশি পরিচিত হ'লো। কিন্তু ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ালো না, মাদামের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ পেলে তাঁকে বলবার মতো সন্ন্যাসীর আর-কিছুই রইল না। তিনি আশা করেছিলেন মাদাম একজন মৈত্রেয়ী হবেন। বৃথা! সন্ন্যাসী ইংরেজি জানতেন না, মাদাম জানতেন না বাংলা বা সংস্কৃত—এই হেতু তাঁরা প্রথম-প্রথম কেউ কাউকে বুঝতেন না। তারপর, জনশ্রুতি এই, তাঁরা পরস্পরকে বড্ডো বেশি বুঝে ফেললেন। সে যাই হোক, দয়ানন্দ ছিলেন শক্তিমান তার্কিক। তাঁর প্রভাব এমন বেড়ে উঠছিল যে সন্দেহ করা হয়, তাঁর শত্রুপক্ষ গোঁড়া ব্রাহ্মণের দল এই ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। দয়ানন্দর মৃত্যু আকস্মিক হ'লেও তাঁর অনুগামীরা, আর্যসমাজ নামে যে শক্তিশালী সংগঠন ভারতবর্ষে গঠন করেন আজও পর্যন্ত তা সমস্ত ইওরোপীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিকে অস্বীকার ক'রে চলে।

পাওহারি বাবা

দ্বিতীয় সন্ত গাজিপুরের পাওহারি বাবা। তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় কম, কিন্তু তাঁর দেহত্যাগে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী দারুণ শোকাবহ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। প্রায় তিরিশ বছর তিনি গাজিপুরে বসবাস করেন। স্থানীয় গোটা সমাজটা তাঁকে সন্ত বলে শ্রদ্ধা করতো। শেষের নয় বছর তিনি সংসার থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ও বিরাট ফটকে সুরক্ষিত এক টুকরো জমিতে নির্জনবাস করতেন। ভিতরে ছিল এক ফালি ফুলের বাগিচা, একটা কুয়ো, ছোট্টো একটা মন্দির আর তাঁর থাকবার জন্য একটি এক-কামরার ঘর। * তিনি কখনো প্রাচীরের গেট খুলতে দিতেন না, তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা ছাড়া আর-কেউ তাঁকে কখনো দেখতে পেত না। সপ্তাহে একবার, অথবা দশদিনে একদিন, তিনি ফটকের কাছে উঠে আসতেন, কেউ যদি ওখানে আসতো তার সঙ্গে ভিতর থেকে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতেন। ডাকলে শোনা যায় এমন ব্যবধানে সর্বদা থাকতেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কিন্তু যদিও তাঁর ঋষিতুল্য অনুজ তাঁকে বলেছিলেন যে, 'ভারতবর্ষে বর্তমান কলিযুগের দুঃখ-দৈন্য তিনি আর সইতে পারছেন না', অনুজের কথা তিনি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারেননি। এই শ্রদ্ধেয় সন্ত একদিন প্রাত্যহিক স্নানশেষে পূজা করলেন, সমস্ত শরীরে বিশুদ্ধ ঘৃত লেপন ক'রে ছড়িয়ে দিলেন সুগন্ধ চন্দন আর ধূপ, তারপর তাঁর নির্জন ঘরের চারদিকে আগুন জ্বাললেন। চারদিকে অগ্নিশিখা যখন লেলিহান হ'য়ে উঠলো, তিনি সেই

দ্রষ্টব্য : * ইণ্টারপ্রিটার, জুন, ১৮৯৮। ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার, ১৯শে জুন, ১৮৯৮।

অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর শেষ আহুতি দিলেন। কেউ এসে উদ্ধার করবার পূর্বে এই বৃদ্ধ সন্ত সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হলেন, দেহাবশেষ আনুষ্ঠানিক ভাবে গঙ্গার পবিত্র জলে বিসর্জন দেওয়া হলো। ভারতবর্ষে কিছু একটা ঘটলে তার যথার্থ বিবরণ পাওয়া সর্বদাই কঠিন। যে-ঘরে বৃদ্ধ সন্ত বহু বছর বসবাস করেছেন সেই ঘরের অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না, বৃদ্ধের অগ্নিদগ্ধ দেহের আবিষ্কার বিষয়েও নয়। কিন্তু এই সন্তের আত্ম-বলিদান মেনে নিতে অনিচ্ছুক কোনো-কোনো সুহৃদ্ অগ্নিকাণ্ডকে একটা দুর্ঘটনা বলেন, অন্যেরা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গকে সন্ত-জীবনের সংগত সমাপ্তি বলে মনে করেন।

তাঁর পাওহারি নামটি কখনো-কখনো 'পহারি' বলে লেখা হয়। বলা হয়, ওটা 'পবনাহারী' অর্থাৎ যিনি বায়ুসেবনে জীবনধারণ করেন, এই শব্দের সংকোচনের ফল।

তাঁর ধর্মশিক্ষা সম্ভবত রামকৃষ্ণের ধর্মশিক্ষার অনুরূপ, কিন্তু আমি এ-বিষয়ে অধিকতর নির্ভুল বিবরণ সংগ্রহে সমর্থ হইনি। তথাপি তাঁর আসন যে একজন ঋষি এবং সন্তের আসন তা সর্বজন স্বীকৃত বলে মনে হয় এবং দয়ানন্দ সরস্বতী ও রামকৃষ্ণের মতো ব্যক্তিদের পাশাপাশি আসনে যে তাঁর ন্যায়সংগত অধিকার কেশবচন্দ্র সেনের এই অভিমত যথেষ্ট প্রত্যয়যোগ্য সত্য। একদিকে সর্বজনমান্য এই সন্ত-সন্ন্যাসীরা, অন্যদিকে রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের মতো ধর্মসংস্কারকবৃন্দ— ভারতবর্ষের লোকেরা এই উভয়ের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ নিশ্চিত ও নিঃসংশয়রূপে করে থাকেন। কোনো ধর্মশিক্ষক ও ধর্মসংস্কারকের সত্য ও নিষ্ঠার প্রতি আস্থা স্থাপনের পূর্বে সংসারের যশ-মান-ধন ও যাবতীয় ভোগ-সুখ তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন কিনা এটা অবশ্যই তারা দেখতে চান। তেমনি কঠোর নিগ্রহ ও কৃচ্ছ্র সাধনের অভিজ্ঞতা সন্তবৃত্তির অনিবার্য শর্ত। এবং শেষ পর্যন্ত অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনও জনতার কাছে প্রথাবিরুদ্ধ তো নয়ই বরং ঈশ্বরানুপ্রাণিত ঋষিকে যাচিয়ে দেখবার পক্ষে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

কোনো-কোনো সাধু-সন্ত 'পরমহংস' নামে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এই নামটি ইংরেজিতে তর্জমা করা কঠিন। হিন্দুদের প্রত্যেকটি রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য যে-সব ছিদ্রান্বেষী পণ্ডিতদের বাঁকা হাসির উদ্রেক করে তারা এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ করেন 'রাজহাঁস'। কিন্তু উর্ধ্বাকাশে ডানা-মেলে-দেয়া বিহঙ্গের * সঙ্গে উক্ত প্রাচীন উপাধির তর্জমাকে মিলিয়ে নিলে হয়তো তা অধিকতর বিশ্বস্ত হবে। তাছাড়া, 'হংস' শব্দটি বিহঙ্গকুলে হাঁসের সঙ্গে অভিন্ন হলেও সমার্থক নয়। কিন্তু যদিও এই পরমহংসরা নিজেরাই এক সর্বোত্তম সমাজ গড়ে তোলেন, তথাপি আমাদের ধারণায় ভারতবর্ষে এমন অনেক ছিলেন, এবং এখনো আছেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো জীবনযাপনের জন্য যাঁরা পরমহংসদের কাছাকাছি আসন পাবার যোগ্য। আমরা জানি, ভবনগরের প্রধানমন্ত্রী উদয়শংকর প্রাচীন সন্ন্যাসী জীবনের কঠোর নিয়মনিষ্ঠা নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে কী কঠিন সাধনা করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের জীবনও—যদিও তিনি একজন বিবাহিত পুরুষ এবং চরাচরে অনেক ভ্রমণ ও পরিক্রমণ করেছেন—তাঁর জীবনও চরম আত্মত্যাগের জীবন, যে-কোনো পরমহংসের জীবনের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

* লেখক এখানে 'ঈগল' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'পরমহংসের সঙ্গে ঈগলের তুলনা আমাদের কাছে প্রত্যয়যোগ্য মনে হয় না অনুবাদক।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেশবচন্দ্র সেনের বন্ধু ও নিত্যকালের পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধেও ঐ একই উক্তি করা চলে। ধনী ও প্রভাবশালী পরিবারের কর্তাব্যক্তি হলেও তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় সংসারের বাইরে ধ্যান, অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তায় অতিবাহিত করতেন। ভারতবর্ষে যে-বয়সটা বড্ডো বেশি বলে মনে হয় তিনি এখন সেই বিরাশি বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন এবং আমরা এ-কথা শুনে আনন্দিত যে তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিতব্য একখানা আত্মজীবনী লিখেছেন। কিছুদিনের জন্য কেশবচন্দ্র সেনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও কেশবচন্দ্রের বন্ধু ও রক্ষক হিসেবে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে সাধারণত যা মনে করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় সদস্যের সাক্ষাৎকারের যে-বিবরণ এখানে দেওয়া যাচ্ছে তা থেকে এই মানুষটির জীবন সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা হবে। আমার কাছে তাঁর কিছু চিঠিপত্র আছে। এগুলো চমৎকার শিক্ষাপ্রদ কিন্তু প্রকাশিতব্য নয়। কিছুকাল পূর্বে এই বৃদ্ধ সন্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুবর্গ যে সাক্ষাৎ করেছিলেন তার একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

"দোতলার চওড়া বারান্দায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে একটি চেয়ারে এই শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে আসন গ্রহণ করলাম। মহর্ষি প্রথমে কথা বললেন। তিনি বললেন, 'তিন মাস পূর্বে তোমরা এখানে এসেছিলে, তারপর থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেক কমে এসেছে। আমি চোখে অনেক কম দেখি, কানে কম শুনি। কিন্তু সেটা আমার কাছে বড়ো একটা ক্ষতি

বলে মনে হয়না। বাইরের জগতের সঙ্গে আমার ব্যবহার যত ক্ষীণ হয়ে আসছে, অন্তরের জগতের সঙ্গে আমার যোগ ততই প্রবলতর হচ্ছে। অন্তরের আদান প্রদান ব্যাপারে এখন আর আমার তরফ থেকে কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই। আমি নিজের মনে চুপ করে বসে থাকি আর এই সঙ্গসুখ উপভোগ করি।' যখন তিনি এই কথাগুলো বলছিলেন, ভাবাবেগের আভায় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।"

"যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লো কোন্-কোন্ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার জন্য মূল বেদান্ত থেকে শ্লোকগুলি তিনি বাছাই করেছিলেন সে-কথা তাঁর মনে আছে কিনা, সন্ত বললেন : 'বিভিন্ন উপনিষদ থেকে কি উপায়ে এই মূল পাঠগুলো একসঙ্গে আমার অন্তরে এসেছিল এতদিন পরে আমি তা মনে করতে পারছি না। আমার চিত্তে এখন তার নির্যাস রয়েছে, আমি তার মাধুর্য উপভোগ করছি। সুতরাং মূল পাঠগুলো এখন আর আমার পড়বার আবশ্যক হয় না। তোমাদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ যিনি তাঁর থেকে আমরা ক্রমশঃ এগিয়ে যাই তাঁর কাছে যিনি অসীম, এবং তারপর অসীমের মধ্যে অসীমের গৌরব প্রত্যক্ষ করি, দেখি তাঁর অসীম ক্ষমা, দেখি আরো কত কিছু। তোমরা আরো একটু আগে এলে এ-বিষয়ে নানা কথা বলতে পারতুম। চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, এমন সব বিষয়ে এখন আমার মন একেবারে ভরপুর হ'য়ে আছে। এখন, তাই, তোমাদের সঙ্গে বেশি কথা কইতে পরছিনা।...ঈশ্বর-চেতনা আমার হৃদয়কে এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে যে আমি একখানা আত্মজীবনী লিখে ফেলেছি। জানিনা এটা কোন্ কাজে লাগবে। সংসারে এখন তো আমি একেবারেই অকেজো। সংসারের সঙ্গে যোগস্থাপন করবার মতো সম্বল এখন আমার নিতান্তই অল্প।' আমরা যখন বললাম, তাঁর জীবন ব্যর্থ হ'য়েছে বলে আমরা মনে করিনা, কেননা ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে ঈশ্বরের মধ্যে যাপন করবার মতো জীবনের দৃষ্টান্ত তিনিই সংসারকে দিয়েছেন, মহর্ষি বলতে লাগলেন ; 'আমার এখন নির্জন বাস চলছে, কর্মক্ষমতা কিছু মাত্র নেই আর। যে-

কর্মোদ্যম ও ঐকান্তিকতা তোমরা আমার মধ্যে দেখছো তা তোমাদের দেখে-দেখে জাগ্রত হয়। বহুকাল পূর্বে, আমি যখন উপনিষদ-পাঠে ব্যাপৃত ছিলুম, আমার হৃদয়ে জ্যোর্তিময়ের অরুণোদয় ঘটেছিল, আমি উপলব্ধি করলুন 'সত্যমেবাদ্বিতীয়ম্' যে-ব্রহ্ম তাঁর উপাসনা ভারতবর্ষ একদিন করবে। ঐ সময়টায় আমার মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো এমন একজন মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য যে আমার হৃদয়ের সঙ্গী হ'য়ে আমার সকল ভাবের দোসর হ'য়ে হাতে হাত ধ'রে চলতে পারে। তৎকালীন সমাজের জ্ঞানীগুণী, অগ্রণী প্রায় সকলের মধ্যে আমি আমার অন্বিষ্টের সন্ধান করলুম। পেলুম না। আমি তখন হতাশ মনকে চাঙ্গা করতে কলকাতা ত্যাগ ক'রে পাহাড়ে গেলুম। দু'বছর সেখানে থাকবার পর সুতলেজ নদীর নির্ঝর আমার মনে এক নির্মল সংকেত বাণী এনে দিলে। শুনলুম এক কণ্ঠস্বর: কলকাতায় আমার পবিত্র কর্মে ফিরে যেতে কে যেন আমায় তাগিদ দিচ্ছে। এই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বরে আমি এমন বিমূঢ় হ'য়ে গেলুম যে কোনো-কিছুতেই স্বস্তি পেলুম না মনে হলো। ঈশ্বরের আদেশ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে চরাচরের প্রতিটি বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য যেন আমাকে চাপ দিচ্ছে। আমি ঝটপট ফিরে এলুম, ফিরে আসতেই ব্রহ্মানন্দর (কেশবচন্দ্র সেন) সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটলো। যাঁকে এতদিন খুঁজছিলুম তক্ষুনি তাঁকে পেয়ে গেলুম। তখন ঠাওর হ'লো ঈশ্বর কেন আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। আমার আনন্দ তখন বাধাবন্ধহীন। রাতের পর রাত, এমন কি রাত দুটো অবধি, আমরা গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। ব্রহ্মানন্দ আমাকে এমন কথাও বলেছিলেন যে তিনি চলে যাবার পর যাঁরা থাকবেন তাঁরা আমার মনোগত উদ্দেশ্যকে ফুটিয়ে তুলবেন, উন্নীত করবেন। আমি বুঝতে পারছি তাঁর বাণী পূর্ণ হতে চলেছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক কথা।'—আমরা বললুম—'আমাদের আচার্য্যদেব যখন রক্তমাংসে বেঁচে ছিলেন, আপনার সঙ্গে আমাদের এতখানি নৈকট্য আমরা বুঝতে পারিনি। আমাদের ধারণা, ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহন রায়কে

গ্রহণ করলেও আপনাকে এখনো স্বীকার করেনি। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন বা যোগ-এর যে-রূপ প্রকাশ আপনাতে হ'য়েছে, আপনাকে স্বীকার না-করলে ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে ততদূর পৌঁছতে সমর্থ হবে না। আপনাকে গ্রহণ না-করার ফলেই ব্রাহ্মসমাজের আজ এমন শোচনীয় অবস্থা।'

"মহর্ষি বললেন, 'দরিদ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করবার জন্য ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেছেন, বিশেষত আমাদের দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন বাংলাদেশে। রুগ্ন ও জীর্ণ সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ যেমন বেশি ক'রে ঝরে, এই দরিদ্রদেশের সন্তানদের প্রতিও তেমনি ঈশ্বরের এমন ভালোবাসা। এই বিশেষ করুণার জন্য আমরা তাঁর কাছে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। তোমাদের প্রতি তাঁর আনুকূল্য বড়ো বেশি, কর্মের উপযুক্ত ক'রে তিনি তোমাদের গড়েও তুলেছেন। আমি 'পরলোক' ও 'মুক্তি' সম্বন্ধে আমার শেষ রচনার একটা ছোটো ভল্যুম প্রকাশ করেছি। সেটা তোমাদের উপহার দেবো।'—এই সব কথা হবার পর তীর্থযাত্রীরা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্ভার মন নিয়ে বিদায় নিলেন।

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গোপনে গোপনে কী ঘটে চলেছে উপরোক্ত বিবরণ তা কি চকিত দৃষ্টির উদ্ভাস। এই বিবরণ সত্যিকারের ভারতবন্ধুদের কাছে চিত্তাকর্ষক ও সংরক্ষণযোগ্য বলে আমার মনে হ'য়ে ছিল। এ জিনিসটা কিন্তু সেই সব ব্যক্তিদের চোখেও পড়ে না, কল্পনায়ও আসেনা, আমাদের কাছে যারা ভারতবর্ষের বৃহৎ অট্টালিকা, রাজা-মহারাজাদের কথা প্রভৃত বিবরণ সহ বলে থাকেন, বলেন সেখানকার স্তব্ধসৌধ ও জগন্নাথের রথের কথা, ইলোরার গুহা-গহ্বরের কথা। ভারতীয়দের দৃষ্টিতে যাঁরা 'পরমহংস' পদবীর মর্যাদায় উন্নীত হন নি, অথচ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় জীবন যাঁদের সন্তসদৃশ ও ঈশ্বর-সমর্পিত, ভারতবর্ষের কাগজ খুললেই আমরা সেই সব মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ পাই। এটা খুবই সম্ভব যে, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ যাঁরা স্বদেশে সন্ত বলে সম্মানিত ইউরোপীয় সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁরাই আবার নির্বোধ ও ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি বলে গণ্য হন। তথাপি তাঁরা স্বদেশে তাঁদের যথার্থ আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের মধ্যে এমন অসামান্য শক্তির প্রকাশ ঘটেছে 'দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন বাংলাদেশের' শাসকবৃন্দের পক্ষে যা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সংগত নয়।

রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর

আরো একজনের কথা বলছি। আমাদের সম্মুখে রামকৃষ্ণদেব যে-মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর ভূমিকা রচনা করলেন এবং তাঁর সতীর্থরা তাঁর নিঃস্বার্থ ও ঐকান্তিক সাধনার পথে তাঁকে সমর্থন করলেন, এবং কখনো-কখনো সহযোগিতা দ্বারা এগিয়ে নিয়ে গেলেন—সমস্ত ব্যাপারটির একটি অক্ষম রূপরেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি আমি। তাই আরো একজনের কথা বলতে হচ্ছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র ১৩২ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুরের কথা আমরা জানতে পাই। তাঁর বয়স এখন প্রায় সত্তর বৎসর। পোষ্ট অফিসের গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করেন। পরে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বীভৎসতা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। চোখের সম্মুখে হাজার-হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুকে নৃশংসভাবে খুন করতে দেখলেন তিনি। দেখলেন, ধনী দরিদ্র হয়ে গেল, আর যারা দরিদ্র তারা অসংগতরূপে প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী হলো। তার ফলে পরিবর্তনশীল সংসারের অনিত্যতা তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করলো। তাঁর আগ্রহ ও শক্তি-সামর্থ্য জাগ্রত করতো এমন সব বিষয় থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হ'লেন। তরুণ বয়স থেকেই তাঁর মন ধর্ম ও দর্শন চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল এবং তখন থেকে কর্মজীবনের সমস্তটা ব্যাপী তিনি পবিত্র ধর্মপুরাণ পাঠে প্রভূত সময় ব্যয় করতেন। সুতরাং বিদ্রোহের ভয়াবহ রূপ ও তার দমনরীতি চাক্ষুষ করবার পর তিনি যে তাঁর ঐহিক দৈন্যের গুহা থেকে পালিয়ে গিয়ে অমল ও নিত্য সুখের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য কী।

অনেক যোগী-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিস্তর আলাপ হলো তাঁর, কিন্তু কেউই তেমন কাছে এলেন না। অবশেষে তাঁর পোষ্ট অফিসের জনৈক সহকর্মী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শালিগ্রামের প্রত্যয়যোগ্য আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক-রূপে সুপারিশ করলেন। দুই বৎসর ধ'রে এই পথপ্রদর্শকের বক্তৃতা শুনলেন তিনি, উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মীয় রচনার সঙ্গে তাঁর ধর্মোপদেশ মিলিয়ে দেখলেন, এবং তারপর তাঁর 'চেলা' বা শিষ্য হ'য়ে গেলেন। আগ্রায় যতদিন ছিলেন, তিনি কাউকে তাঁর গুরুর সেবা করতে দিতেন না। তিনি গুরুর জন্য জাঁতা পিষতেন, রান্না করতেন, গুরুকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন। প্রত্যহ সকালবেলা দেখা যেত তিনি গুরুর স্নানের জন্য দু' মাইল দূর থেকে মাথায় জলের কলসী বয়ে নিয়ে আসছেন। তিনি তাঁর মাস-মাইনেটাও এই সন্তের হাতে তুলে দিতেন, সন্ত তা থেকে কিছুটা স্ত্রী-পুত্র পরিবার ও শিষ্যবর্গের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করতেন, বাকিটা দাতব্য করতেন। তাঁর ঘরোয়া ব্যাপারে সব কিছুই চলতো গুরুর নির্দেশে। কিন্তু এ-সব কর্মের বিরোধিতা আসতো তাঁর স্বজাতি কায়স্থদের কাছ থেকে। স্বজাতিরই কেউ এই সন্তের খাবার রান্না ক'রে দিচ্ছে, তাঁর থালা থেকে খাচ্ছে, এটা তারা অনুমোদন করতো না, কেননা সন্তর জাত ছিল ভিন্ন, তিনি ক্ষেত্রী ছিলেন। কিছুদিন পরে শিষ্য শালিগ্রাম ডাক বিভাগের কর্ম থেকে অবসর নিতে চাইলে গুরুর অনুমোদন পাওয়া গেল না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যখন তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে নিযুক্ত হলেন, তিনি মনে-প্রাণে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করবার নিমিত্ত জীবিকা থেকে অবসর গ্রহণের জন্য গুরুর পায়ের কাছে বসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু এবারেও গুরু বারণ করলেন। বললেন, আপিসের কর্তব্য কর্ম তাঁর আধ্যাত্ম সাধনার উন্নতির পথে বিঘ্ন হবে না। তদনুযায়ী তিনি আগ্রা ত্যাগ করলেন এবং তারপর, শোনা যায়, বহু বৎসর তাঁর নূতন পদে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে গেছেন। ডাক-বিভাগের অনেক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কার করেন তিনি।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গুরু দেহত্যাগ করলে পোস্টমাস্টার-জেনারেল মহাশয় জীবিকা ত্যাগ ক'রে স্বাধীন হওয়াকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এবং

তারপর তিনি নিজে গুরু হ'য়ে যারা সাহায্য ও পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে আসতো তাদের আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশ করতে লাগলেন। প্রায়ই এমন হ'তো যে, তাঁর বাণী শুনতে এসে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে আরম্ভ করতো। এইভাবে জনসাধারণের মধ্যে এ রকম একটা বিশ্বাস চালু হলো যে রায় শালিগ্রামের কাছে কেউ এলে তাকে ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যেতেই হবে। না, শুধু এই নয়, কথাটা আরো একটু গড়ালো : শালিগ্রামের দোতলার ঘরে যে-আলো জ্বলে তা কারো চোখে পড়লে আর দেখতে হবে না, সেই আলোর প্রভাবে ঘর-সংসার, আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করে তাকে সমাজের মধ্যে শেষ পর্যন্ত অকেজো হয়ে থাকতে হবে। এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এখনো জীবিত আছেন শোনবার পর প্রত্যহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ তাঁর বাড়িতে এসে ভিড় করে। ধর্মোপদেশের জন্য দিনে-রাত্রে তিনি অন্তত পাঁচটি ধর্মসভার অনুষ্ঠান করেন এবং ফলত, দু'ঘণ্টার বেশি ঘুমোন না। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, নির্ধন, মন্দ, ভালো নির্বিশেষে তাঁর কাছে সমান আদর। সকলেই স্বাগতম। লোকেদের বিশ্বাস তিনি অলৌকিক ব্যাপার ঘটাতে পারেন, তিনি নিজে কিন্তু এইসব ব্যাপার অসংগত ও অমর্যাদাকর বলে জ্ঞান করেন। শোনা যায়, তৎকালীন বড়লাটের অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন স্বর্গীয় ডাক্তার মুকুন্দলাল মশাই অতিরিক্ত প্রাণায়াম ক'রে যে-সব রোগী অচেতন হয়ে পড়তো তাদের হামেশা এই সন্তর নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং তিনি—এই সন্ত—একবার তাকালেই রোগীরা চেতনা ফিরে পেত। তখন তিনি তাদের বলতেন যে, এই প্রাণায়াম অভ্যাসে সুফলের আশা কম, উপরন্তু বহুক্ষেত্রে এসব অভ্যাস ক্ষতিকর।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

এতক্ষণ অনেকের কথা বলেছি। এতে অন্তত এটা দেখা গেছে যে, সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণদেব একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নন। এবং এও দেখা গেছে যে, মনু-বর্ণিত চার পর্যায়ের জীবনযাপন প্রণালীর প্রাচীন প্রথার পরিবর্তন হলেও পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবেশে প্রাচীন-কালের সন্ন্যাসীর মতো এখনো ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী আছেন। ভারতবর্ষের নানা প্রামাণিক তথ্য দ্বারা এই সত্য প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রচুর সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া যায়, যাঁদের কার্যাবলী প্রমাণসিদ্ধ না বলে কিংবদন্তী বলে মনে হতে পারে। অত্যধিক যোগ-ব্যায়ামের ফলে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে কঙ্কালসার, কেউ কেউ যে একেবারে উন্মাদ হ'য়ে যেত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অত্যধিক যোগাভ্যাসের বিরুদ্ধে যে সাবধানবাণী আছে তা-ও এই কারণেই। গৌতম বুদ্ধ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর উপলব্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রথাগত যাবতীয় কঠোর কৃচ্ছ্রতা ও আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে গিয়ে দেখলেন যে এতে বিশেষ কিছু সুবিধা নেই ; তখন তিনি প্রথাগত সমগ্র প্রণালীটাকেই শুধু অনাবশ্যক নয় ক্ষতিকর হিসাবেও বাতিল করলেন। এই সকল ব্যাপারে তিনি মধ্যপথ অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন।

সমকালীনদের মধ্যে প্রখ্যাত, এবং কেশবচন্দ্র সেন-উল্লিখিত চতুর্থ পরমহংসের প্রতি আমরা যদি পুনরায় দৃষ্টিক্ষেপ করি তো তাঁর জীবন ও ধর্মাদর্শ বিষয়ে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইনা এবং ভারতের চিরকালের এক বিশেষ শ্রেণীর বলে তাঁকে আমরা স্বীকার ক'রে নিই। তাঁর অর্থাৎ রামকৃষ্ণের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে আছে।

কিন্তু তার মধ্যে কোথাও-কোথাও এমন সব অদ্ভুত অতিশয়োক্তি ও স্ববিরোধী কথাবার্তা আছে যে তাঁর চরিত্র ও জাগতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একটি সত্য ও নির্ভুল ধারণা গঠন করা অসম্ভব বলে মনে হয়। সুতরাং রামকৃষ্ণের প্রখ্যাত শিষ্যদের অন্যতম বিবেকানন্দকে অনুরোধ করলাম তাঁর পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গুরুর বিষয়ে তিনি যা জানেন তা যেন আমাকে লিখে জানান। এর পরে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের জীবনের একটি পূর্ণায়ত বিবরণ আমি পেয়েছি। ভারতীয় ঐতিহ্যগত উপাদানগুলো এই বিবরণেও অনুপস্থিত নয়। তবু আমার বক্তব্যের মধ্যে সে-সব বিষয় যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

সংলাপ প্রক্রিয়া

কী ক'রে একটা নতুন ধর্ম, অথবা একটি ধর্মসম্প্রদায়, সহসা প্রকাশিত হ'য়ে ধীরে-ধীরে বেড়ে ওঠে, তার গভীরে আমাদের দৃষ্টিকে জাগ্রত করে বিবেকানন্দর বিবরণী। ধর্মক্ষেত্রে অতীত ঘটনার বিবরণ নিয়ে আলোচনা, পুনরালোচনার মধ্য দিয়ে আবহমান কাল থেকে মুখে-মুখে যে-ধর্মচর্চা চলে আসছে তা ধীরে-ধীরে ধর্মের কেমন রূপান্তর ঘটায় তার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে যে-'যুক্তিবিচার প্রক্রিয়া' চিরকাল সক্রিয় আমরা এখানে তা-ই লক্ষ্য ক'রে থাকি। এই 'যুক্তিবিচার প্রক্রিয়া' ইতিহাসের নানা ঘটনার উপর প্রয়োগ করলে বহু ভাবধারার যোগাযোগ ও বিনিময়, সংলাপের আদানপ্রদান এবং নানারূপ মননক্রিয়ার ফলে অনিবার্যরূপে সঞ্জাত পরিবর্তনগুলো বোধগম্য হয়। বাস্তবিক পক্ষে এটা হ'লো যাকে জার্মান ভাষায় বলে 'রস নিঙরে বার করা' তা-ই, গ্রীকরা বলে প্রসঙ্গের টানা-পোড়েন, অথবা সংলাপ। এমন কি হেগেলের 'যুক্তিবিচার প্রক্রিয়া' —যে ভাব-আন্দোলন অস্তি থেকে নাস্তি ও পরে উভয়ের সমন্বয়সাধনের দিকে আমাদের দুর্বার বেগে পরিচালিত করে—সেই প্রক্রিয়ার উৎসকে আমি 'সংলাপ প্রক্রিয়া'র ব্যাপকতর নামে অভিহিত করি। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে এই সংলাপ-প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব অনেকখানি। ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও নেই যা এই প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত না-হয়ে ঐতিহাসিকের কাছে গিয়ে পৌঁছেচে। এই সংলাপ-প্রক্রিয়া অবশ্যই পুরাণ-প্রণালী থেকে ভিন্ন। পুরাণ-প্রণালী সংলাপ-প্রক্রিয়া অন্তর্গত হ'লেও বিশেষ বিধান অনুযায়ী চালিত হয়। আধুনিক ইতিহাসেও আমরা এই সংলাপ-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি, যদিও সংবাদপত্র, সাংবাদিক,

মহৎ রাজনীতিজ্ঞের স্মৃতিচারণ ও আত্মজীবনীতে এই প্রক্রিয়ার সংক্রাম অসম্ভব বলে মনে হয়। যে-যুগে শর্টহ্যাণ্ড বা মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, লেখাপড়া ছিল মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ, কোনো বিশেষ ঘটনা বা বাণী লিপিবদ্ধ করবার কথা কোনো ইতিহাস-লেখকের মনে উদয় হবার পূর্বে যখন দু'-তিন পুরুষ মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে এমন একটা সুদূর অতীতের কথা আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথম নথিভুক্ত হবার পূর্বে ইতিহাসের প্রতিটি বিষয় সংলাপ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়, এই সত্যকে ভুলে গিয়ে সংলাপ-প্রক্রিয়াকেই উপেক্ষা করেছেন বহু ইতিহাসবিদ্, এটা খুবই অদ্ভুত মনে হয়। বস্তুত সংলাপ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না-এলে আমরা ইতিহাসের কোনো সত্যকে জানি না, জানতে পারি না, অন্তত এই একটি শিক্ষাও যদি ইতিহাসবিদ্‌দের থাকতো তাহলে কত কূট সমস্যার সমাধান, কত স্ববিরোধী বিষয়ের মীমাংসা, এবং কত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সহজ স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল হ'তে পারতো। যে-স্থানে বসে লিখছি, সেই এম্‌স্ শহর থেকে প্রেরিত সেদিনকার ঐ টেলিগ্রামের কথাই ধরা যাক। প্রুশিয়ার রাজাকে বেনেদিত অবমাননা করেছেন বলে যা প্রতীয়মান হয়েছিল গোটা দুনিয়াকে তা জানিয়ে দেওয়াই ছিল উক্ত টেলিগ্রামের উদ্দেশ্য। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র ইওরোপের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর ঘটিয়েছিল ঐ টেলিগ্রামটি, ওটা আধুনিক ইতিহাসের চূড়ান্ত ঘটনাবলীর অন্যতম স্বাক্ষর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে যা-কিছু বলা হয়েছে ও করা হ'য়েছে তার বাইরে আমরা আর কী জানতে পারি? বিসমার্কের নিজের স্বীকৃতি, চিন্তা ও আত্মকথন, এই টেলিগ্রামপ্রেরক আমার বন্ধু এ্যাবিকনকে বলা তাঁর উক্তি, টেলিগ্রামের অব্যবহিত পরে যে লড়াই বেঁধে উঠল তাকে সমর্থন বা নিন্দা ক'রে জার্মানি ও ফ্রান্সে চিন্তা ও বক্তব্যের যে ঘূর্ণি দেখা গেল—এ-সবের বাইরে আমরা আর কী জানতে পারি? কোনোদিন কি জানতে পাবো বেনেদিতের সেই উক্তির অবিকৃত শব্দগুলি, তার ধ্বনি, তার কণ্ঠস্বর? যে-দৃপ্ত স্বরে সম্রাট উত্তর দিয়াছিলেন সেই স্বর? নিজের

চিন্তা ও অভিমত ইওরোপের সমস্ত প্রান্তে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শুনে ইস্পাত কঠিন চ্যান্সেলারের জিভ দিয়ে ভীত-ত্রস্ত যে-ধ্বনি নির্গত হয়েছিল, তা ? অথচ এ-সব এই সেদিনের ঘটনা। তাঁর যথাযথ উক্তি ও সম্রাটের প্রত্যুত্তরের কথা বেনেদিত স্বয়ং আমাদের বলেছেন ; ঐ টেলিগ্রামটি সমস্ত জগতে মনগড়া সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হবার পর প্রকৃতপক্ষে তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন সে-কথা বিসমার্ক স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন। তখনকার বাস্তব ঘটনার কথা ইতিহাসবিদ্‌রা জানেন কি ? বেনেদিত, সম্রাট এবং বিসমার্কের উক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য তাদের জানা আছে কি ? এখানে, এই এমস্‌ শহরে ঐ উক্তিগুলির জন্ম, যদিও এ নিয়েও নানা মুনির নানা মত। আমাদের কাছে ফরাসী কূটনীতিজ্ঞের প্রদত্ত বিবৃতি আছে। বিসমার্ক প্রদত্ত বক্তব্য থেকে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তথাপি এই বিবৃতি এসেছে সংলাপ-প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে—এবং বেনেদিতের সঙ্গে বৃদ্ধ রাজার আলাপচারিতা ও মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকে তা উদ্ভুত। অপরপক্ষে, ওঅটার্লু'র ফরাসী অফিসারের মুখে যে-কথাগুলো বসানো হয়েছে আধুনিক ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই তা জানেন—এবং French Memoirs-এর পাঠকেরাও জানেন, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উচ্চারিত প্রকৃত কথাগুলো কী। যে-কথা আবহমান কাল থেকে মুখে-মুখে প্রচলিত তার বিকার ঘটবে না বলে আমরা কি কখনো আশান্বিত হ'তে পারি ?

এই বিকৃতির ফলে কথা বা ধারণার যে পরিবর্তন ঘটে তা অবস্থা-গতিকে অল্পবিস্তর প্রবল হ'য়ে দেখা দেয় ;—পরিবর্তন কখনো ঘটে না এমন কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই পরিবর্তন বা বিকৃত তথ্য কোনো নবধর্মের প্রবর্তন এবং তার প্রবর্তকের বিবরণের সঙ্গে সবচেয়ে অধিক পরিমাণে অন্বিত হ'য়ে আমাদের কাছে এসে হাজির হয়। বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে এটা সুবিদিত যে কপিলাবস্তুর যুবরাজ বলে কোনো ব্যক্তি ছিলেন এ-কথা কোনো-কোনো প্রখ্যাত পণ্ডিত স্রেফ অস্বীকার করেছেন, যদিও এই যুবরাজের জীবন, কর্ম ও বাণী

সম্পর্কে যে-বিস্তৃত বিবরণ আছে এমন আর অন্য কোনো ধর্মপ্রবর্তকের বেলা পাওয়া যায় না। এবং এ-কথা স্মর্তব্য যে, ঐশী চরিত্র বা অলৌকিক চরিত্র বলে বুদ্ধজীবনীর কোথাও কোনো দাবী নেই, উপরন্তু স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর নিজের এবং তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে এই ধরণের অসাধারণ স্বত্ব অগ্রাহ্য করেছেন। বুদ্ধের মতানুসারে, পৃথিবীতে মানুষ প্রচ্ছন্ন শক্তির দিক থেকে সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এমন কি বাস্তব ক্ষেত্রেও, তৎকালে প্রচলিত নানা দেবতা ও দেবদূতের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে তার স্থান। পৃথিবীতে সেই শ্রেষ্ঠ জীবেরই অন্যতম বলে তিনি প্রসন্ন ছিলেন। বুদ্ধের অসংখ্য নামের মধ্যে 'অতিদেব' অর্থাৎ সকল দেবতার উর্ধ্বে, একটি। এবং এই নামের মধ্যেই প্রমাণ, বুদ্ধের অনুগামীরা বুদ্ধ ও দেবতাদের কী চোখে দেখতেন।

ইতিহাসে সংলাপ-প্রক্রিয়ার অপরিহার্য প্রভাব স্বীকার করে নিতে স্বভাবতই সময় নেবে। অসংখ্য সমস্যা ও অন্তহীন অসাধুতার জালে পাকে-পাকে জড়িয়ে আছি আমরা, সংলাপ-প্রক্রিয়া আমাদের মুক্তি দেবে। যদি এই সত্য আমরা জানতে পাই যে, কোনো একদিন—তা সে একদিন, এক সপ্তাহ বা এক বৎসর পরেই হোক, সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে, তা সে ঈশ্বর প্রদত্ত হলেও, সংলাপ-প্রক্রিয়ার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। এই প্রক্রিয়া মানবপ্রকৃতির রক্তে ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে যাবে একদিন। তখন স্বকৃত সমস্যাগুলো আর থাকবে না; বিকৃত ও শিশুতোষ অলৌকিক কাহিনীগুলো ফিরে পাবে তার রক্তিম চারিত্র্যশক্তি, ভুল স্বর্গের মুখোশ-আঁটা অনেকগুলো মুখের যথার্থ মানবীয় রূপ, স্নিগ্ধ ও স্বর্গীয় চোখের আলো আবার আমরা দেখতে পাবো। শ্রুতি বা লোকপরম্পরাগত উক্তির মধ্যে যুক্তিবিচার-প্রণালী বা সংলাপ-প্রক্রিয়া—বিশেষত সেই নির্মল ও স্বভাবগত আদিকারণের মধ্যে—কী ভাবে কাজ করে চলেছে যদি তাঁরা একবারও সে-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন তাহলে সমস্ত ধর্ম-প্রবক্তার ধার্মিক মন কৃতজ্ঞবোধ করবে, শান্তি পাবে।

এইজন্যই, এবং পরবর্তী ফলশ্রুতি ভিন্ন যেহেতু এই প্রক্রিয়া কদাচিৎ ক্ষ্য করা যায় সেইজন্যেও, রামকৃষ্ণ-শিষ্য তাঁর গুরুর বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ থাকতে সচেষ্ট হ'য়ে যে-সামান্য আলেখ্য আমাদের পহার দিয়েছেন আমাদের কাছে তার অন্তর্নিহিত মূল্য ছাড়াও আরো কটি বৈশিষ্ট্য আছে: প্রত্যেক ধর্মকে শৈশব পার হ'য়ে ইতিহাসে ান লাভ করতে যে-বিশেষ পরিবেশ ও অবস্থার মুখাপেক্ষী হতে হয় ার প্রতি আলোকসম্পাত এই আলেখ্যর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মের তো মানবীয় বিষয় আর কিছুই নয়, আর-কিছুতেই মানবপ্রকৃতির দৌর্বল্য এমন ক'রে প্রকাশিত হয় না। ধর্মের আদি উৎস যা-ই হোক না কেন, প্রথমাবধি এর ক্রমবিকাশের শেকড় যে-নরম মাটিতে তার নাম মানবপ্রকৃতি। প্রত্যেক ধর্মে প্রতিক্রিয়াশীল এই মানব-প্রকৃতির অনুশীলন অতএব তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আবশ্যিক পাঠ।

আমি বিবেকানন্দকে এ-কথা যথাসাধ্য স্পষ্ট করেই জানিয়েছি যে, তাঁর গুরুর যে-সকল ইতিবৃত্ত এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, শিষ্যদের কাছে যতই শিক্ষাপ্রদ হোক না কেন, ইওরোপীয় পাঠকের কাছে তা একেবারে উদ্ভট ও হাস্যকর শোনাবে। গুরুর বাল্যকালের অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা মূর্তিমতী দেবীর আবির্ভাব, সন্ন্যাসীকে দেবী ভাষা ও সাহিত্যের এমন জ্ঞান দিলেন যা ইতিপূর্বে বাস্তব জীবনে কস্মিনকালেও সন্ন্যাসীর ছিল না —ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের মত হতভাগ্য অবিশ্বাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া, উক্ত সন্তের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা, যতই প্রামাণিক হোক না কেন, ঈপ্সিত ফলের পরিবর্তে বিপরীত পরিণতি ঘটাবে। বিবেকানন্দর মত মানুষ, যিনি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাকে ভালোভাবেই জানেন, আমার বক্তব্যের তাৎপর্য নির্ভুল বুঝেছিলেন। তথাপি ভক্ত-শিষ্যের অদম্য অলৌকিকত্বের প্রবণতা এবং আমি যাকে সংলাপ-প্রক্রিয়া বলি তার কিছু-কিছু ছিটেফোঁটা গুরুর বিষয়ে তাঁর নিরলঙ্কার বর্ণনার মধ্যেও এখানে ওখানে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এবং আছে বলেই আমি আনন্দিত: কারণ, এ বর্ণনায় আমরা এমন শিক্ষা পাই যা কোনো ঐতিহাসিকের কাছে পাওয়া যায় না;—একজন মানুষ বা একটি ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তাঁর—অথবা তাঁর আস্থাভাজন পূর্বসূরীর—মন-গড়া সত্যকেই শুধু জাহির করেন, প্রকৃত সত্য-উদ্ঘাটনের কোনো শিরঃপীড়া নেই তাঁর। 'ব্রহ্মবাদী'র আরেকটি সংখ্যায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণজীবনীর অপর এক ইতিবৃত্ত নিয়েও আমি যতদূর সম্ভব আলোচনা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ ইতিবৃত্ত 'ব্রহ্মবাদীর' ১৯ সংখ্যায় মধ্যপথে বন্ধ হয়ে গিয়ে আর বেরোল না।

শুনেছি, রামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর। রামকৃষ্ণের মর্ত্য জীবনের সূত্রপাত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী এবং সমাপ্তি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট* রাত্রি একটা। যে গ্রামে তাঁর জন্ম সেখানে প্রধানত নীচু শ্রেণীর লোকের বাস, তার বেশির ভাগই কর্মকার। কর্মকার অর্থাৎ কামার থেকে কামারপুকুর নামের উৎপত্তি। কর্মকার ছাড়া আরো যারা বসবাস করতো তারা ছুতোর মিস্ত্রি, গোয়ালা, কৈবর্ত আর তেলী। ঐ গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারের কর্তাব্যক্তি ছিলেন রামকৃষ্ণের পিতৃদেব। অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু নিষ্ঠাবান গোঁড়া ব্রাহ্মণের পথ থেকে ঈষৎ ভ্রষ্ট হবার চেয়েও অনশন তাঁর কাছে শ্রেয় ছিল। এই গোঁড়া ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রের আদি নাম ছিল গদাধর, গদাধর বিষ্ণুর এক নাম, এক হাতে যিনি গদা ধারণ করে আছেন। এই নামকরণের একটু ইতিহাস আছে : একদিন রামকৃষ্ণের পিতৃদেব গয়ায় তীর্থ করতে গেলে স্বপ্নে বিষ্ণুর আবির্ভাব হয়, বিষ্ণু ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে তিনি তাঁর পুত্ররূপে জন্ম নেবেন। পরবর্তী জীবনে গদাধরের নামকরণ হয় রামকৃষ্ণ। শুনেছি, এবং এ-বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে, রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মস্ত বড়ো ঈশ্বরভক্ত, ছিলেন শুচিশুদ্ধ, সৎ, সরল ও স্বাধীন প্রকৃতির সুদর্শন পুরুষ। জনশ্রুতি এই—আর জনশ্রুতি তো আমাদের পূর্বোল্লেখিত সংলাপ প্রক্রিয়ার আরেক নাম—যে, কতকগুলো অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁর, 'বাক্য-

* তাঁর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে বিভিন্ন ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণজীবনীর নানা উল্লেখের মধ্যে বিভিন্ন সন-তারিখও নির্ভুল নয়।

সিদ্ধি' ছিল—তার মানে, কারো বিষয়ে, ভালো-মন্দ যা কিছু তিনি বলতেন অনিবার্যরূপে তা ফলতো। গ্রামের লোকেরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতো। পথে তাঁকে আসতে দেখলে তারা দাঁড়িয়ে পড়তো, নমস্কার করতো, এমন কি তাঁর সামনে উচ্চ কথাবার্তাও কেউ কখনো করতো না।

প্রায় অনিবার্যত, রামকৃষ্ণের মা চন্দ্রামণি দেবী ছিলেন দয়া ও সারল্যের প্রতিমূর্তি। শুনেছি, তাঁর ছেলের ধনী ভক্ত-শিষ্য মথুরানাথ একদা তাঁর কাছে এসে হাজার কয়েক টাকা উপহার গ্রহণের জন্য তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু মথুরানাথকে বিস্মিত করে তিনি সে-দান প্রত্যাখ্যান করেন।

পূর্বপুরুষের ভিটে 'দেরে' গ্রামে থাকা কালে পিতৃদেবের স্বাধীন প্রকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামের জমিদার তার পক্ষের সাক্ষী হিসেবে ক্ষুদিরামকে তলব ক'রে ভয় দেখালো যে সাক্ষী হ'তে অস্বীকার করলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে তাঁকে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করা হবে। সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন ক্ষুদিরাম, তারপর গ্রাম ছাড়লেন, 'দেরের দু-তিন মাইল পূর্বে কামারপুকুরে এসে ডেরা বাঁধলেন। সেখানে সত্যিকার কিছু সুহৃদের সহায়তায় সামান্য জীবিকার ব্যবস্থা হ'লো। তথাপি দীন-দরিদ্রের জন্য সর্বদা তাঁর হৃদয়ের দ্বার খোলা থাকতো। প্রধানত ধর্মভীরু ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকতেন তিনি, যজমানী করতেন আর ধর্মের চরম উপলব্ধির প্রয়াস পেতেন।

তাঁর সম্বন্ধে একটা কাহিনী আছে। একদিন তিনি বারো-চোদ্দ মাইল দূরে তাঁর কন্যাকে দেখতে বেরিয়ে পড়লেন। অর্ধেক পথ এসেছেন এমন সময়ে তিনি দেখতে পেলেন এক বেলগাছ, নতুন পাতার সবুজে আছন্ন। বিল্বপত্র শিবপূজায় লাগে, হিন্দুর কাছে অতীব পবিত্র। বসন্তের প্রাক্কালে ঝরাপাতার আসরে এতদিন তিনি শিবপূজায় দেবার মতো একটি ভালো পাতাও সংগ্রহ করতে পারেননি। এখন এই অজস্র সবুজপত্র সন্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ করলেন, যত ইচ্ছে

তুলে নিয়ে, শিবপূজার জন্য বাড়ি ফিরলেন। কন্যাদর্শনে আর যাওয়া হ'লো না। তিনি রামের বড়ো ভক্ত ছিলেন, ভগবানের পবিত্র প্রতিমূর্তি শ্রীরামচন্দ্র তাঁর গৃহদেবতা। গ্রামের বাহিরে তাঁর এক টুকরো জমি ছিল ;—বপনের সময়ে তিনি চাষের জন্য লোক সংগ্রহ ক'রে নিজেই মাঠে নেমে পড়তেন, রঘুবীরের নামে নিজ হাতে প্রথমেই কিছু বীজ ধান ছড়িয়ে দিতেন, তারপর চাষীদের কাজ সুরু হতো। তাঁর জীবদ্দশায়, শোনা যায়, ঐ ছোট্ট জমিতে এত ফলন হতো যে তা দিয়ে তাঁর সারা বছর চলে যেত। রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ নায়ক রঘুবীর অর্থাৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপর তিনি সর্বক্ষণ এমন নির্ভরশীল ছিলেন যে পরের দিনের চিন্তা ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ নির্ভার থাকতে পারতেন। তাঁরই ছেলে রামকৃষ্ণ। কী যে ছিল রামকৃষ্ণের মধ্যে, সবাই তাঁকে প্রথম দর্শনেই কাছে টানতো, ভালোবাসতো, মনে করতো যেন নিজেদের আত্মীয়-পরিজনেরই একজন।

ধর্মীয় কোনো যাত্রা বা পালাগান একবার মাত্র দেখলে বা শুনলে আর কথা নেই, কিশোর বালক পরক্ষণে তার সুরসুদ্ধ নকল ক'রে সমস্তটা হুবহু অভিনয় ক'রে দেখাতেন। চমৎকার গানের গলা ছিল তাঁর, গান-বাজনায় ঝোঁকও ছিল। দেব-দেবীর পট বা প্রতিমূর্তির দোষ-গুণ বিচারে ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দক্ষ বিচারক, এবং গ্রামবাসীরা তাঁর রায়কেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিত। তিনি স্বয়ং দেব-দেবীর মূর্তি গড়তে এবং পট আঁকতে পারতেন। পরবর্তী জীবনে শ্রীকৃষ্ণের একটি ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি'কে তিনি নিজেই মেরামত করেছিলেন, কলকাতা থেকে প্রায় চার মাইল উত্তরে রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এখনো সেই প্রস্তরমূর্তিটি আছে। বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পালাগান শুনে তিনি তাঁর খেলার সঙ্গীদের সংগ্রহ ক'রে তাঁদের বিভিন্ন ভূমিকা অভিনয়ের শিক্ষা দিতেন, তারপর মাঠের মধ্যে গাছের নিচে আসর জমতো। কখনো কখনো তিনি শিবের মূর্তি গড়ে সঙ্গীদের নিয়ে পুজো করতেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয়, তিনি

কথক ঠাকুরের মুখে শুনে শুনে রামায়ণ-মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি নানা পুরাণে পারদর্শী হ'য়ে উঠলেন। এই কথকঠাকুর ছিলেন তৎকালীন সমাজের এক শ্রেণী, যারা ভারতবর্ষের অশিক্ষিত জনসাধারণের উন্নতিকল্পে পুরাণের কথকতা ও শিক্ষা দিয়ে ফিরতেন। (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের জ্ঞান নিশ্চয়ই তিনি বাংলা ভাষার মারফৎ অর্জন করেছিলেন কেননা, রামকৃষ্ণের পরম সুহৃদ মজুমদারের মতানুসারে তিনি সংস্কৃত ভাষার এক বর্ণও জানতেন না।)

যে-গ্রামে তিনি বাস করতেন তার সীমান্ত বরাবর পুরী যাবার তীর্থপথটি চলে গেছে। হামেশা এই পথ বেয়ে অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী ও ধর্মার্থীর দল আসা-যাওয়া করতেন, গ্রামের জমিদার লাহা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালায় এসে তাঁরা আশ্রয় নিতেন। রামকৃষ্ণ প্রায়ই চলে যেতেন সেখানে, তাঁদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করতেন, তাঁদের কাছে শুনতেন নানা ভ্রমণ কাহিনী, আর লক্ষ্য করতেন তাঁদের আচার, নিয়ম, অভ্যাস।

ভারতবর্ষের প্রথানুযায়ী কোনো অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী সমস্ত বিদ্বান-পণ্ডিত বা অধ্যাপকবৃন্দ এসে একত্রিত হন। লাহা পরিবারের বাড়িতে এ রকম একটি সমাবেশে ধর্মতত্ত্বের কোনো জটিল প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠলো, কিন্তু সমবেত পণ্ডিতেরা তার কোনো মীমাংসায় উপনীত হ'তে পারলেন না। বালক রামকৃষ্ণ তখন তাঁদের মধ্যে গিয়ে তাঁর সহজ সরল ভাষায় সমস্যাটির দ্রুত কিনারা ক'রে দিলেন। ঘরসুদ্ধ বিদ্বজ্জনের অবাক হয়ে গেলেন। (এ-রকম ব্যাপার যে কোনো শিশু-সুসমাচার থেকে সংগৃহীত হ'তে পারে)।

বারো বছর বয়সে রামকৃষ্ণ একদিন মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নির্মল নীল আকাশের দিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে এক ঝাঁক শুভ্র বলাক উড়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্যের মধ্যে রঙের বৈচিত্র্য তাঁর কল্পজগতে সহস এমন অপরূপ হ'য়ে ঝিলকিয়ে উঠলো, তাঁর মনের গভীরে ভাবনাগুলে এমন ধাক্কা খেল যে, তিনি মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে গেলেন। (ব্যাপারটিকে

যদিও একটি কাব্যিক রূপের বিস্তৃতির মধ্যে সহজেই টেনে নেওয়া যায় তথাপি খুব স্বাভাবিকভাবে রোগনিরূপণবিদ্যার—অর্থাৎ, প্যাথোলজির—ব্যাখ্যা সম্মত বলে ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্যরূপে গণ্য হতে পারে)।

ক্ষুদিরামের সংসারে তিন পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে রামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। রামকৃষ্ণের বড় দাদা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণে মহাপণ্ডিত ছিলেন। কলকাতায় তাঁর নিজস্ব টোল ছিল। ষোল বছর বয়সে রামকৃষ্ণের বাবা রামকৃষ্ণকে পৈতে দিলেন, উপবীতধারী রামকৃষ্ণকে এর পরে নিয়ে আসা হলো এই টোলে। এখানে এসে তিনি অস্তি ও নাস্তি, মায়া ও ব্রহ্ম বিষয়ে অনেক উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রালোচনা শুনলেন, শুনলেন আত্মার উপলব্ধিতে কী ক'রে জীবের মুক্তির দ্বার খুলে যায়। দেখলেন, যাঁরা এইসব উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেন বাস্তব জীবনে তাঁরা পারতপক্ষে তা অনুসরণ করেন না, যশ-মানের আকাঙ্ক্ষায়, কাম-কাঞ্চনের লিপ্সায় তাঁরা নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত। এইসব দেখেশুনে তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। তিনি সরাসরি তাঁর ভাইকে বললেন, যে বিদ্যা শিখে শুধু কিছু রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়, যে বিদ্যা শিখে কেবল চাল-কলা বাঁধতে হয় সে বিদ্যা তাঁর দরকার নেই। এইসব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে যে বিদ্যা, যে-বিদ্যার পুরস্কার ঈশ্বর লাভ, তার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ছিল। সুতরাং তখন থেকে তিনি ঐ টোলের ধারে কাছেও ঘেঁষতেন না।

কলকাতা থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে। গঙ্গাতীরে এই মন্দিরটি ভারতের অতি মনোরম মন্দিরের মধ্যে অন্যতম। রাণী রাসমণির আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক অর্থাৎ গুরুর নামে মন্দিরের দলিল লেখা হয়েছিল, কেননা রাণী রাসমণি ছিলেন নীচু জাতের, তাঁর নামে দলিল করলে উঁচু শ্রেণীর লোকেরা মন্দিরে এসে ভোগ-প্রসাদ গ্রহণ করবেন না এমন আশংকা ছিল। রামকৃষ্ণের বড় দাদাকে এই মন্দিরের পুরোহিত করা হ'লো। প্রথম যেদিন দ্বারোদ্ঘাটন ক'রে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হ'লো, দুই ভাই চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু সেই সময় রামকৃষ্ণের জাত-বিচারের সংস্কার এত

প্রবল ছিল যে, একজন শূদ্র স্ত্রীলোকের অধীনে তাঁর দাদার চাকরি নেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে শাস্ত্রনিষিদ্ধ অপর কারো রান্না স্পর্শও করলেন না। সুতরাং উৎসবের দিনে প্রায় পনেরো-কুড়ি হাজার লোককে যখন নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য দ্বারা আপ্যায়িত করা হ'লো, একমাত্র তিনিই রইলেন উপবাসী। রাত্রে নিকটস্থ মুদিখানায় গিয়ে এক পয়সার মুড়কি কিনে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন। কিন্তু দাদার প্রতি টান ছিল বলে হপ্তা-খানেক বাদে তিনি আবার এসে উপস্থিত। দাদার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকতে রাজী হলেন এই শর্তে যে হিন্দুর পবিত্র স্থান গঙ্গাতীরে তিনি স্বপাক খাবেন এই অনুমতি তাকে দিতে হবে। মাস কয়েক পরে নিদারুণ অসুস্থতার জন্য মন্দিরের সেবাইতের কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর দাদার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ল। তখন ঐ কর্তব্যের ভার নেবার জন্য তিনি রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ রাজী হলেন এবং কালীর পূজারী হিসেবে বহাল হ'য়ে গেলেন।

মনে প্রাণে সরল ও অকপট ছিলেন তিনি, ব্যবসায় বুদ্ধি নিয়ে কিছু করতেই পারতেন না, সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন কিছু করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। মন্দিরের পূজারী হবার পর তিনি এখন কালী প্রতিমাকে তাঁর নিজের মা ও বিশ্বমাতা রূপে জ্ঞান করতে লাগলেন। যেন শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, যেন তাঁর হাত থেকে খাবার খেতে পারে, কালীর বিগ্রহকে তিনি এমন জীবন্ত মনে করতেন। নিয়মিত পূজা-অনুষ্ঠানের পর তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কালীমন্দিরে বসে থাকতেন, স্তবগান করতেন, মায়ের কাছে শিশুর মত কথা বলতেন, আবদার জানাতেন, যতক্ষণ না তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেত। তিনি যেমন চান তেমন ক'রে মায়ের দেখা মেলে না, এই নিয়ে কখনো-কখনো তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদতেন, কিছুতেই শান্ত হতেন না। তার সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত দেখা দিল। এই তরুণ পুরোহিতকে কেউ-কেউ পাগল ভাবল। কেউ বললো, না, পাগল না, তিনি এক মস্ত ঈশ্বর-ভক্ত, বাইরের এই পাগলামি

ঈশ্বরের প্রতি তার ভক্তি-ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। তার মা ও ভাইয়েরা ভাবলেন, যুবতী স্ত্রী ও নিজস্ব সংসারের দায়িত্ব এলে তার এইসব পাগলামি ঠাণ্ডা হবে। এই ভেবে তারা তাঁকে স্বগ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে এসে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঁচ বছরের কন্যা শ্রীমতী সারদা দেবী বা সারদামণি দেবীর সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। শোনা যায়, তাঁর উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে যখন তাঁর মা ও ভাইয়েরা ব্যাপৃত তখন তিনি নিজেই নাকি তাদের বলেছিলেন যে, অমুকচন্দ্র তমুকের কন্যা তার সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে যুক্ত হ'তে পূর্ব থেকেই নিয়তি নির্দিষ্ট হ'য়ে আছেন এবং ঐ কন্যা ঈশ্বরীর সর্বগুণসম্পন্না। তদনুযায়ী মা ও ভাইয়েরা গিয়ে উক্ত পাত্রীর সন্ধান পেলেন।

রামকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন যে, কোনো-কোনো স্ত্রীলোক দেবী বা ঈশ্বরীর সকল গুণ নিয়ে জন্মায়। কোনো-কোনো স্ত্রীলোক আবার বিপরীত—তারা আসুরী শক্তি নিয়ে আসে। প্রথমোক্ত মেয়েরা তাদের স্বামীর ধর্মকর্মের সহায়ক হয়, স্বামীকে কখনো কাম বা কামুকতার দিকে ঠেলে নিয়ে যায় না। এদের দেখলেই চেনা যায়। বহু বৎসর পরে দক্ষিণেশ্বরে একদা সম্পূর্ণ অচেনা এক মহিলা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। এই মহিলা সম্ভ্রান্ত বংশের এক ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং পাঁচ-ছ'টি সন্তানের জননী, কিন্তু তবু রূপ ও যৌবন তার অটুট। রামকৃষ্ণ তক্ষুনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, এই রমণী যে দেবীগুণ ভূষিতা তিনি তার প্রমাণ দেবেন। তিনি শিষ্যদের ধূপ জ্বালতে বললেন, তারপর কিছু ফুল ঐ মহিলার পায়ের কাছে রেখে তাকে 'মা' বলে ডাকলেন। এই ভদ্রমহিলা রামকৃষ্ণকে কখনো দেখেননি, ধ্যান বা সমাধির কিছুই তিনি জানতেন না হঠাৎ কেমন গভীর মূর্ছার মধ্যে অজ্ঞাতে তার হাত দু'খানি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে উঠে এল। তার এই মূর্ছার ভাব ঘণ্টা কয়েক রইল, রামকৃষ্ণ এই কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেলেন যে শেষে না তার স্বামী বাজে তুকতাকের জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। সুতরাং তিনি ঐ ভদ্রমহিলার চেতনা

ফিরিয়ে দেবার জন্য মা কালীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে মহিলার জ্ঞান ফিরে এল, তিনি চোখ মেললে দেখা গেল তার চোখ দুটো মাতালের মতো টকটকে লাল। তিনি পরিচারিকার হাত ধরে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, বাড়ি ফিরলেন। এ-রকম অনেক ঘটনার এটি একটি নমুনা মাত্র। (নিশ্চিতরূপে সংবেশন বা মোহনিদ্রার একটি দৃষ্টান্ত)।

পুরুষ মানুষের সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ বলতেন। পরবর্তী জীবনে, তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য ছেলে-বুড়োর দল যখন তাঁর কাছে ভিড় ক'রে আসতো, তিনি ভিড় থেকে কোনো-কোনো লোককে বাছাই ক'রে দেখিয়ে দিতেন, এই জীবনেই কার-কার ধর্মোপলব্ধি ঘটবে আর ধর্মের প্রতি সত্যিকার আকর্ষণ আসবার পূর্বে কারই বা আরো একটু ভোগ-সুখের জীবন কাটাতে হবে। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'গত জন্মে রাজা হয়ে পৃথিবীর চূড়ান্ত ভোগ-সুখের মধ্যে যে-মানুষ অন্তঃসারশূন্যতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এ-জন্মে সে পূর্ণতা পাবেই।'

বিবাহের পর রামকৃষ্ণ কলকাতায় ফিরে এসে আবার মন্দিরের ভার নিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আগ্রহ কোথায় কমবে না, হাজারগুণ বেড়ে গেল। যেন তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব চোখের জলের অজস্র ধারায় গলে-গলে ভেসে গেল। আমার কাছে প্রকাশিত হও মা, আমাকে দয়া করো মা—দেবীর নিকট তাঁর এই আবেদন মর্মরিত হ'লো। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুশয্যায় কোনো মা-ও কখনো এমন ক'রে কাঁদেনি। তাঁর চারদিকের সমস্ত লোক ভিড় ক'রে এলো তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু সন্ধ্যালগ্নে শঙ্খধ্বনি যখন আরেকটি দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করতো, তিনি ডুকরে কেঁদে উঠে বলতেন, "মা, মা গো, আরো একটা দিন শেষ হ'লো তবু তোর দেখা পেলাম না।" লোকেরা ভাবলো, হয় তিনি পাগল হ'য়ে গেছেন অথবা নিদারুণ কোনো যন্ত্রণায় ভুগছেন। যারা নাম-যশ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, কী করে তারা কল্পনা করবে যে তারা যেমন তীব্রভাবে তাদের স্ত্রী ও সন্তান

দম্পতিদের ভালোবাসে তেমন ক'রে কোনো মানুষ ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে ভালোবাসতে পারে? রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথবাবু, এই তরুণ ব্রাহ্মণের প্রতি যাঁর অনুরাগ বরাবর ছিল, রামকৃষ্ণর পাগলামি সারাবার জন্য তাঁকে কলকাতার সবচেয়ে সেরা ডাক্তারদের কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। শুধু ঢাকার একজন চিকিৎসক তাঁদের বললেন যে, এই লোকটি মস্তবড় যোগী-সন্ন্যাসী, যদি এঁর কোনো রোগ থেকে থাকে তো সে রোগ সারাবার মতো ওষুধ তাঁদের ভেষজবিজ্ঞানে নেই। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বন্ধুরা সব আশা ত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর ভক্তি-ভালোবাসা দিনের পর দিন বাড়তে লাগলো। এমন হলো যে একদিন তিনি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ তীব্রভাবে অনুভব করলেন। এই বিচ্ছেদবেদনা, এই নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠলে তিনি যখন নিজের হাতে নিজের জীবনে ছেদ টানতে উদ্যত হলেন এমন সময়ে বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে তিনি মা কালীর দর্শন পেলেন। বারংবার এই দর্শন হ'লো তাঁর, তিনি শান্ত হলেন। বাস্তবিকপক্ষে এই দর্শন সত্য কিনা মাঝে মাঝে এ বিষয়ে তাঁর সংশয় হতো, তখন তিনি নিজের মনে যাচিয়ে দেখতেন, যদি এটা হয়, যদি ওটা ঘটে, তো বিশ্বাস করি। অমনি এটা-ওটা ঘটতো এমন কি যে-সময়ে তিনি আশা করতেন ঠিক সেই সময়ে। যেমন একদিন তিনি নিজের মনে বললেন: "এসব বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি এ আমার মাথার ব্যামো নয় যদি—রাসমণির যুবতী মেয়ে দুটি তো এ-মন্দিরে কখনো আসেনি—যদি তারা আজ বিকেলে ঐ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে।" ঐ মেয়েদের কাছে রামকৃষ্ণ একেবারেই অচেনা। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, ঠিক এমনি সময়ে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা, তাঁর নাম ধরে তাঁকে ডেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে: মা কালীর দয়া নিশ্চয়ই তিনি পাবেন। অন্তঃপুরবাসী এইসব মেয়েরা, বিশেষত যুবতী বয়সে

কখনো বাইরে পাঁচজনের সামনে বেরোতেন না, কিন্তু কেমন ক'রে কে জানে, সেদিনই তাদের মনে মন্দির দেখবার তীব্র বাসনা জাগলে তারা ওখানে যাবার অনুমতি পেয়ে গেল।

এই দর্শনের বেগ ও পৌনঃপুনিকতা দিনে-দিনে বাড়তে লাগলো, তাঁর সমাধির কাল দীর্ঘতর হ'লো, সবাই বুঝতে পারলো তাঁর পক্ষে নিত্যকর্ম আর সম্ভব নয়। শাস্ত্রে এই রকম বিধান আছে যে, পূজারী তার নিজের মাথায় ফুল রেখে তার উপাস্য দেবতাকে নিজের মধ্যে ধ্যান করবেন। মাথায় ফুল রেখে রামকৃষ্ণ যেমন তাঁর উপাস্য মায়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভাবলেন অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন, তদবস্থায় থাকলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর যখন-তখন, ক্ষণে-ক্ষণে, তিনি এমন আত্মহারা হয়ে পড়তে লাগলেন যে দেবীর জন্য সাজানো নৈবেদ্য তিনি নিজেই খেয়ে ফেললেন, কখনো-কখনো দেবী প্রতিমাকে ভুলে গিয়ে তিনি নিজেকেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করতে লাগলেন। এতে প্রথমে আপত্তি করলেন মথুরানাথ, কিন্তু এর অল্পদিন পরে, শোনা যায় যখন তিনি রামকৃষ্ণের দেহে শিবের দর্শন পেলেন তখন থেকে তিনি রামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান রূপে জ্ঞান করতে লাগলেন এবং কথা বলবার সময় সর্বদা তাঁকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। মন্দিরের নিত্যকর্মের জন্য মথুরানাথ রামকৃষ্ণের ভাগ্নেবে নিযুক্ত করে রামকৃষ্ণকে আপন মনে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঈশ্বরের পৌনঃপুনিক দর্শনে রামকৃষ্ণের প্রদীপ্ত মন শান্ত থাকতে পারে না, অনন্ত দিব্য রূপের মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সুতরাং লোকচক্ষুর অন্তরালে বারো বৎসর তিনি তপস্যা করলেন। এই কঠোর আত্মকৃচ্ছ্রতার দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি পরবর্তী জীবনে বলেছেন: সে সময়টাতে ধর্মের একটা প্রচণ্ড ঝড় যেন তাঁর মধ্যে বিপুল বেগে প্রবেশ করে সমস্তটা তছনছ করে দিয়েছিল। এই ঝড়ো বেগ যে এত দীর্ঘস্থায়ী হয় সে বিষয়ে তখন তাঁর কোন ধারনা ছিল না। সে-সময়ে বছরের পর বছ

তাঁর চোখে বিন্দুমাত্র ঘুম আসেনি, ঝিমুনিও না, তাঁর দৃষ্টি সর্বদা উন্মুক্ত ও নিবদ্ধ থাকতো। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হতো তিনি বুঝি গুরুতর পীড়িত, তখন তিনি মুখের সম্মুখে একখানা আয়না ধরে চোখের পাতা পড়ে কিনা দেখবার জন্য অক্ষিকোটরে আঙুল চালিয়ে দিতেন, কিন্তু চোখের পাতা পড়ে না। হতাশ হয়ে তিনি কেঁদে উঠতেন : "মা, মা গো, তোকে ডেকে, তোকে বিশ্বাস করে কি এই ফল হ'লো ?" দূর থেকে তখন মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে আসতো, মধুরতর হাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী এসে বলতো : "হ্যারে তুই যদি তোর শরীরের এই ছোট্টো অস্তিত্বের মোহ ত্যাগ করতে না পারিস তো কেমন করে বৃহৎ ও পরম সত্যকে উপলব্ধি করবি তুই ?"

"আধ্যাত্মিক আলোর একটা স্রোত এসে" তিনি বলতেন, "তখন আমার মনকে ভাসিয়ে দিয়ে সুমুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেত। আমি বলতাম, 'মা, ভুলে-ভরা মোহাচ্ছন্ন মানুষের কাছ থেকে আমি যা জানতে পারিনি তোমার কাছ থেকে তাই আমি শিখবো।' একই কণ্ঠস্বর তখন বলতেন, 'হ্যাঁরে, তা-ই।"

"আমি তখন একদিনের তরেও আমার শরীরের কথা ভাবিনি।" তিনি বলতে লাগলেন, "আমার চুল বড়ো হ'য়ে কখন জট পাকিয়ে গেল আমি জানতেই পারিনি। আমার ভাগ্নে হৃদয় রোজ আমার খাবার নিয়ে আসতো। কোন দিন খাওয়াতে পারতো, কোনো-কোনো দিন এক গ্রাসও আমাকে গেলাতে পারতো না। আমি অবশ্য এ-সব কিছুই টের পেতুম না। মাঝে-মাঝে আমি চাকর-বাকর মেথর-ঝাড়ুদারদের ঘরে গিয়ে নিজের হাতে ঝাড়-পোঁছ করতুম আর বলতুম : 'মাগো, আমি ব্রাহ্মণ, আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ আর এরা ছোটো, এরা নীচু জাত—আমার মধ্যে এ-সব ধারণা ঘুচিয়ে দে। বিচিত্র রূপে এদের মধ্যেই তো তুই বিরাজমান।'

'মাঝে-মাঝে আমি', তিনি বলতেন, 'একপাশে কিছু সোনা আর রূপোর টাকা, অন্য পাশে ছাই-মাটির গাদা নিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে

বসতুম। ডান হাতে টাকা-পয়সা আর বাঁ হাতে মাটি নিয়ে মনকে বলতুম: মন রে, ছ্যাখ, রাণীর মুখ-আঁকা এই যে জিনিসটা সংসার একেই বলে টাকা। এর ক্ষমতা কত। এ দিয়ে চাল-ডাল তরি-তরকারি কেনা হয়, গরীব খেয়ে বাঁচে। দালান-কোঠা, বাড়ি-ঘর, ছুনিয়ার যা কিছু বড়ো বড়ো কাজ, সব হয় এই টাকায়। কিন্তু এ দিয়ে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কোনো সুবিধা হয় না। তাহ'লে ভেবে ছ্যাখ, এই টাকা তো মাটির তুল্য।—তারপর দু'হাতের টাকা আর মাটি মিশিয়ে দিয়ে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলে-বলে মনের মধ্যে এ-ছুয়ের পার্থক্য যখন ঘুচে যেত তখন টাকা আর মাটি দু-ই ছুঁড়ে দিতুম গঙ্গার জলে। লোকে আমাকে পাগল বলতো, তাতে আর আশ্চর্য কী।'

এই সময়ে একদিন তাঁর পরম ভক্ত মথুরানাথ দেড় হাজার টাকা দামের সোনার কাজ করা একখানা শাল এনে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিলেন। এই শাল গায়ে দিয়ে রামকৃষ্ণকে প্রথমে বেশ খুশি-খুশি মনে হ'লো। কিন্তু একটু পরেই মথুরানাথ অবাক হ'য়ে দেখলেন, রামকৃষ্ণ গায়ের শালখানা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়ালেন, তার উপর থু থু ছিটোলেন, তারপর ওটা দিয়ে ঘর মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন; 'এতে কেবল দেমাক বাড়ে, সচ্চিদানন্দের উপলব্ধিতে এটা কোনো কাজেই আসেনা, তাহ'লে ছেঁড়া কাঁথার চেয়ে এ আর বেশি কী!'

'সেই সময়ে,' রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার মনে হতো যেন সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে। এত অসহ্য লাগতো যে, আমি গঙ্গায় গিয়ে সমস্তটা দিন মাথায় ভিজে গামছা চাপিয়ে গলাজলে দাঁড়িয়ে থাকতুম। তখন একজন ব্রাহ্মণ রমণী এসে দিন তিনেকের মধ্যে আমাকে সারিয়ে তুললো। সে আমার সমস্ত শরীরে চন্দন লেপে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিত। তিন দিনে সব যন্ত্রণা উঠে গেল।'

শুনেছি, এই ব্রাহ্মণ রমণী নাকি ছিলেন এক অসাধারণ বাঙালি মহিলা। ভারতীয় দর্শন-পুরাণে অতিশয় বিদুষী ছিলেন তিনি, পুঁথির

র পুঁথি স্মৃতি থেকে অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন। দেশের সেরা-
|রা পণ্ডিতদের সঙ্গে কূটতর্কে তাঁর অপার পারদর্শিতা ছিল। লম্বা
্যাম, কমনীয় চেহারা তাঁর; শরীর ও বুদ্ধিবৃত্তির আশ্চর্য সমন্বয়ে
িনি যে কোনো মেয়ে-পুরুষের তুলনায় বিস্ময়কর ব্যতিক্রম ছিলেন।
গীতজ্ঞ হিসেবে চমৎকার গলা ছিল তাঁর। সংসার ত্যাগ ক'রে
হুকাল যোগাভ্যাসের ফলে অনেক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন
বং সেই সময়ে তিনি সন্ন্যাসীর গেরুয়া পরিধান ক'রে সমগ্র ভারতবর্ষে
ব্রজ্যা নি'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কোথায় কবে তাঁর জন্ম, কোথায়
ল তাঁর বাড়ি-ঘর, তাঁর নামই বা কী—এ-সব বৃত্তান্ত কেউ জানতো
, তাঁর মুখ থেকে কেউ কখনো বের করতেও পারেনি। পাপ-পঙ্কিল
থিবীর দুঃখে কাতর হ'য়ে তিনি যেন 'জগদ্ধিতায়' দেবীরূপে মর্তে
বতরণ করেছেন, এমনি মনে হতো। এটা যেন তাঁর কাছে সুস্পষ্ট
ল যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিশেষরূপে উন্নত হয়েছেন এমন বিশিষ্ট
ন ব্যক্তির সাধনার পথে সহায়তা করবার জন্যই তিনি নিয়তি-নির্দিষ্ট
লেন। জগত্তারিণী মায়ের কাছ থেকে রামকৃষ্ণ পূর্বেই জানতে
|রেছিলেন যে সিদ্ধিলাভের বিশেষ এক পর্যায়ে তাঁকে শিক্ষা দেবার
্য ইনি আসছেন। যখন এলেন রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন,
িনিও রামকৃষ্ণকে চিনতে পেরে বললেন: 'আর দু'জনকে আমি
জে পেয়েছি। তোমাকে আমি অনেক, অনেক বছর ধ'রে খুঁজে
|সছি। আজ পেলাম।' রামকৃষ্ণের অতিমানবীয় রাগভক্তি ও
বিমিশ্র শুদ্ধসত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন তেমন কোনো লোক
পর্যন্ত তাঁর চোখে পড়েনি, সুতরাং এই ব্রাহ্মণীর আবির্ভাবে তিনি
ত্যন্ত স্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর রাগভক্তি ও ভালোবাসার পরিসীমা
ইল না।

এই ব্রাহ্মণীর বিদ্যা-ক্ষমতায় সকলে বিস্মিত হ'লেও এটা তারা
িছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না যে, রামকৃষ্ণের মতো অর্ধোন্মাদ
ক্তিকে তিনি কেমন ক'রে নিজের চেয়েও ঊর্ধে স্থান দেন, স্নেহ করেন।

রামকৃষ্ণ যে পাগল নন, তিনি যে ধরাধামে অবতাররূপে অবতীর্ণ, সে কথা প্রমাণ করবার জন্য তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র থেকে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি দেন এবং মহা মহা পণ্ডিতদের পাণ্ডুলিপি থেকে নানা অংশ পাঠ ক'রে শোনান। দেহে-মনে মহাভাবের যে যে লক্ষণ রামকৃষ্ণের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, চারশ বছর আগে বাংলার মস্ত বড়ো ধর্ম সংস্কারক শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও যে তা প্রকাশিত হয়েছিল শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। যেমন, তৎকালে শ্রীরামকৃষ্ণের এই তীব্র দহন অনুভূতি, সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধ'রে গেছে এমনি ভাব, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে: শত শত শতাব্দী পূর্বে অপাপবিদ্ধ ব্রজবালা কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধার মধ্যে এই অনুভূতি হয়েছিল, তারপর বহু যুগ পরে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে— পরম প্রিয় ভগবানের বিচ্ছেদ বেদনা উভয়েই প্রচণ্ডরূপে অনুভব করেছিলেন। উভয়ের ক্ষেত্রেই যন্ত্রণার উপশম হয়েছিল শরীরে চন্দন লেপন ক'রে ও গলায় সুরভিত ফুলহার পরে'। এই ব্রাহ্মণ রমণী রামকৃষ্ণের এই শারীরিক প্রদাহকে দৈহিক কোনো রোগ বলে গণ্য করেন নি। তাঁর অভিমত এই যে, ঈশ্বরের প্রতি ভালো- বাসা বা ভক্তির এমন একটা স্তর আছে যখন শরীরের এই যন্ত্রণা হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি প্রদাহ-যন্ত্রণার উপশমের জন্য ঐ একই উপকরণ প্রয়োগ করলেন, রামকৃষ্ণ ভালো হ'য়ে গেলেন।

ঐ ব্রাহ্মণীর অবস্থানকালে একটা সময়ে রামকৃষ্ণের আরেক উপসর্গ দেখা দিল। তাঁর প্রচণ্ড খিদে পেত অথচ তা কিছুতেই মিটতে চাইত না। যতই তিনি খেতেন, খিদে থাকতই, যেন কিছুই খাননি এমন মনে হতো। তখনও ঐ ব্রাহ্মণী তাঁকে আশ্বাস দিতেন যে শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য যোগীদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটেছিল। রামকৃষ্ণের ঘরের চতুর্দিকে সব রকম খাবারের থালা দিনরাত্রি সাজিয়ে রেখে দেবার আদেশ হ'লো তাঁর। কিছুদিন ধরে এমনি চললো। চোখের সামনে এত খাবার দেখে-দেখে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণা এলো। তারপর দুষ্ট খিদে কোথায় চলে গেল।

ব্রাহ্মণী কয়েক বৎসর সেখানে থেকে রামকৃষ্ণকে সকল প্রকার যোগাভ্যাস করালেন—যে-সকল যোগ অভ্যাস করলে শরীর মন সম্পূর্ণ করায়ত্ব হয়, যুক্তির নিগড়ে বাঁধা পড়ে ষড় রিপুর প্রচণ্ড ভাবাবেগ, যে-যোগাভ্যাসের ফলে মানুষ পায় গভীর ও একাগ্র অভিনিবেশের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি পায় সেই নির্ভীক ও নির্লিপ্ত মানসিকতা সর্বাঙ্গীণ সত্য ও সত্যসন্ধিৎসুর পক্ষে যা একান্ত আবশ্যিক—সমস্ত, সমস্তই অভ্যাস করলেন রামকৃষ্ণ।

শারীরিক নিয়মনিষ্ঠা বা যোগ শরীরকে দেয় শক্ত বাঁধুনি আর সহিষ্ণুতার ক্ষমতা। প্রায় এই সময়েই রামকৃষ্ণ যোগের অভ্যাস আরম্ভ করেন। প্রথমেই সুরু শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, তারপর পাতঞ্জলির আট রকমের পদ্ধতি। এইসব অভ্যাসের যা চূড়ান্ত ফল তার উপলব্ধ ভূমি তিনি এত অল্প সময়ে উত্তীর্ণ হলেন যে, তাঁর শিক্ষা-গুরুরা অবাক হয়ে গেলেন। এক রাত্রে, তিনি যোগারূঢ় হয়েছেন এমন সময়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো সূতোর মতো দু' ধারা রক্ত। তিনি দারুন ভয় পেয়ে গেলেন। সে-সময়ে মন্দিরের সেবাইত ছিলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই হলধারী। শুদ্ধচিত্ত, মহাপণ্ডিত হলধারী ছিলেন বাকসিদ্ধ পুরুষ, আরো অনেক ক্ষমতা ছিল তাঁর। কিছুদিন পূর্বে তাঁর চরিত্রের কোনো-কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির এমন নিন্দা করেছিলেন রামকৃষ্ণ, যে তিনি চটে গিয়ে রামকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত মোক্ষণ হবে। সুতরাং রামকৃষ্ণ দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু অনতিদূরে ছিলেন একজন মহাযোগী, তিনি রামকৃষ্ণের সহায়তায় এগিয়ে এলেন, সমস্ত ব্যাপারটার অনুপুঙ্খ সন্ধান নিয়ে বললেন যে এই রক্ত মোক্ষণে ভালোই হ'য়েছে। এই রক্ত মোক্ষণের কারণ, বহুজনের হিতসাধন ও শিক্ষার ভার নিতে হবে তাঁকে এবং সমাধির যে-স্তরে প্রবেশ করলে কেউ আর ফিরে আসে না সেই স্তরে প্রবেশের ছাড়পত্র রামকৃষ্ণের নেই। তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই যোগের উচ্চভূমি জয়

করলে মস্তিষ্কে রক্ত সংবহন দ্রুতগতি হয়, মানুষ তখন সমাধিতে সমাহিত হ'য়ে গিয়ে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে তারপর অন্যকে নিগূঢ় অভিজ্ঞতা বলবার জন্য সে আর ফিরে আসে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে মানবজাতির শিক্ষাগুরুরূপে জন্মগ্রহণ করেন মুষ্টিমেয় এমন কয়েকজন মাত্র ফিরে আসতে পারেন। তাঁদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে দ্রুত রক্ত সংবহনের পর কিছুদিন পর্যন্ত তাঁরা অভিন্ন-বোধে সমাহিত থাকেন, কিন্তু কিছু পরেই রক্ত মোক্ষণ ঘটে, তখন তাঁরা শিক্ষাদানে সমর্থ হন।

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণীর যা দেবার ছিল সকল বিদ্যা সমাপ্ত করলেন রামকৃষ্ণ, তথাপি উচ্চতর সত্যের জন্য তাঁর প্রবল পিপাসা নিবলো না। এমন সময় এলেন এক মহাজ্ঞানী বৈদান্তিক, বেদান্তের সত্যে রামকৃষ্ণকে পৌঁছে দেবার ভার নিলেন তিনি। বলিষ্ঠ, শালপ্রাংশু, বিরাট শক্তিধর পুরুষ এই সন্ন্যাসীর নাম তোতাপুরী। অতি ছেলে-বেলা থেকেই তিনি এই পথে এসেছিলেন, দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার পর বেদান্তের পরম সত্য লাভ করেন। দিগম্বর ছিলেন তিনি, ঘরে থাকতেন না। ইচ্ছামাত্র যখন অসংখ্য প্রাসাদের দরোজা তাঁর জন্য নিয়ত উন্মুক্ত থাকতে পারতো, তিনি সর্বদা রাত্রিযাপন করতেন হয় কোনো বৃক্ষের অথবা নির্মল নীল উদার আকাশের নিচে, এমন কি শীত-বর্ষার যে-কোনো ঋতুতে। তিনদিনের বেশি কোথাও থাকতেন না, কারো কাছে খাবার চেয়ে খাবেন সে-শর্মা তিনি নন। বাতাসের মতো মুক্ত তিনি, দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়ান, খাঁটি সত্য-সন্ধর সাক্ষাৎ পেলে শিক্ষা-উপদেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তিনি তাকে আত্মোপলব্ধ পরম সত্যের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। ভালোভাবে উপলব্ধি করলে বেদান্ত যে জীবনের ব্যবহারিক সূত্রেও গ্রথিত হ'তে পারে তিনি ছিলেন সেই সত্যেরই জীবন্ত বিগ্রহ। গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখামাত্র বেদান্তের পরম সত্যের বীজ ধারণে উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই মহাপুরুষকে তিনি চিনতে

পারলেন। রামকৃষ্ণকে ডেকে তিনি তক্ষুনি বললেন, 'মেরে বেটে! ক্যা তুম বেদান্ত কী শীখ লেনা চাহতে হো? তো আও, মঁয় তুঝে সব কুছ শীখাউঙ্গা!'—মা কালীকে জিজ্ঞেস না-ক'রে কোনো কাজ করতেন না রামকৃষ্ণ। তিনি বললেন, তিনি তো এ-সবের কিছুই জানেন না, সুতরাং মাকে জিজ্ঞেস ক'রে তিনি জানাবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীকে জানালেন, তিনি প্রস্তুত। সন্ন্যাসী তখন রামকৃষ্ণকে বেদান্ত সাধনায় ব্রতী করালেন, অদ্বৈতবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হলে কোন কোন নিয়মে ধ্যান করতে হবে সমস্তটা শিখিয়ে দিলেন। তিন দিনের মধ্যে রামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধিতে সমাহিত হ'য়ে গেলেন, নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়র কোনো বোধ থাকে না। শিষ্যের মধ্যে সিদ্ধির এই ক্ষিপ্রতা লক্ষ্য করে সন্ন্যাসী তো হতবুদ্ধি। তিনি বলে উঠলেন, 'অরে য়হ ক্যা রে! জো মুঝে চালীস্ বরষ কঠিন তপস্যা করনে কে বাদ মিলা, ওয়হ তুমনে তীন হী দিন মে পা লিয়া! তুমছে শিষ্য কহনে কা মেরা সাহস নহী হোতা! আজ সে তুম মেরে সখা হো।' রামকৃষ্ণের প্রতি এই সন্ন্যাসীর টান এত তীব্র ছিল যে, তিনি তাঁর কাছে দীর্ঘ এগারো মাস রয়ে গেলেন, নিজের শিষ্যের কাছেই শিখলেন অনেক কিছু। এই সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে একটা কাহিনী আছে। তিনি সর্বদা ধূনি জ্বালিয়ে রাখতেন, ধূনির আগুনকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করতেন। একদিন ধূনি জ্বালিয়ে তার পাশে বসে তিনি যখন রামকৃষ্ণের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন এমন সময়ে একটি লোক এসে ধূনির আগুন থেকে তামাক ধরালো। ব্যস্, আর যায় কোথা, ধূনির শুচিতা নষ্ট হতে দেখে সন্ন্যাসী তো অগ্নিশর্মা! পরক্ষণেই শিষ্যের মৃদু তিরস্কার তিনি শুনতে পেলেন: সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের এই বুঝি তোমার রীতি? ব্রহ্ম কি আছেন কেবল তোমার ঐ ধূনির আগুনেই, ঐ লোকটার মধ্যে কি নেই? যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তাঁর কাছে আবার ছোটো-বড়োর ভেদ কী?'—

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সন্ন্যাসী বললেন, 'আরে! য়হ তো ঠিক বোলা, অচ্ছা, অব সে তুম মেরা ক্রোধ দেখনে নহী পাও গে।' সন্ন্যাসী বরাবর তাঁর কথা রেখেছিলেন।

জগত্তারিণী মায়ের প্রতি রামকৃষ্ণের অগাধ ভালোবাসা। এটা কিন্তু সন্ন্যাসী ভালো বুঝতে পারতেন না। নিছক কুসংস্কার বলতেন, ঠাট্টা করতেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে বোঝালেন যে, যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁর কাছে তুমি-আমি বা ভগবান কেউ নেই, তিনি আবাঙমনসো-গোচরম্' বাক্য-মনের অতীত। যেইমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম কণামাত্র সগুণ হলেন, অমনি তিনি বাক্য-মনে ধরা দিলেন, বিশ্বমানস ও অসীম চৈতন্যের অধীন যে-মন সেই মনের সীমানায় চলে এলেন। মানুষের কাছে তখন এই সর্বজ্ঞ ও অসীম চৈতন্যস্বরূপ কখনো মা, কখনো ভগবান।

তোতাপুরী বিদায় নেওয়ার পর রামকৃষ্ণ স্বয়ং নির্বিকল্প সমাধিতে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে যোগস্থাপন ক'রে, সর্বদা অবস্থান করতে প্রয়াসী হ'লেন। পরবর্তী জীবনে এই সময়কার কথা মনে করে তিনি বলে-ছিলেন: 'আমি এই অবস্থায় এক নাগাড়ে ছ' মাস ছিলুম। এ-অবস্থায় কেউ পৌঁছতে পারে না, পারলেও ফিরে আসতে পারে না। শরীর-মন টেকে না, লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু আমার এই শরীর তো সত্ত্বঃগুণের আধার, সাধনার অনেক ঝক্কি সইতে পারে। সাধনার ঐ দিনগুলোতে আমার বাহ্যচেতনা একেবারেই থাকতো না। সে-সময়ে এক সাধু আমার জন্য ওখানে এসেছিলেন দিন-তিনেক, তিনি না-থাকলে পুষ্টির অভাবে আমার দেহটাকে বাঁচানো যেত না। তিনি আমার সমাধির অবস্থা চিনতে পেরে এই দেহটা রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট যত্ন নিলেন, আমার কিন্তু দেহবোধ বিন্দুমাত্র ছিল না। তিনি রোজ খাবার নিয়ে আসতেন ; আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার, দেহবোধে জাগ্রত করবার সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হ'তো তিনি মস্ত একটা লাঠি দিয়ে আমাকে পিটোতেন, যদি যন্ত্রণাবোধে আমার দেহবোধ ফিরে আসে। কখনো

কখনো তিনি সামান্যতম সফল হ'লেই জোর ক'রে আমার মুখের মধ্যে দু-এক গ্রাস ঠেলে দিতেন, ততক্ষণে আমি আবার গভীর সমাধিতে হারিয়ে গেছি। কোনো-কোনো দিন আমাকে নিদারুন পিটিয়েও যখন তিনি আমার কাছ থেকে এতটুকু সাড়া পেতেন না, তিনি গভীর দুঃখবোধ করতেন।' ছ'মাস পর নিদারুণ অনিয়মে শরীর ভেঙে পড়লো, রামকৃষ্ণ রক্ত-আমাশায় শয্যাশায়ী হ'লেন। এই রোগযন্ত্রণা এমন হ'য়েছিল যে, তিনি বলেছেন, আস্তে-আস্তে দুই-এক মাসের মধ্যে তিনি তাঁর দেহবোধে ফিরে এসেছিলেন। গ্রামের ডাক্তারের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্যলাভ করলেন, তাঁর ভিতরকার গভীর আধ্যাত্মিক স্রোত তখন আরেক দিকে বাঁক নিলো। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসায় বৈষ্ণবীয় রীতি ও আদর্শ উপলব্ধি করবার জন্য তিনি সাধনা সুরু করে দিলেন। বৈষ্ণবদের প্রথা অনুসারে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা যে কোনো একটি লৌকিক সম্বন্ধের মধ্যে ব্যক্ত হ'য়ে থাকে—প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ, সখার সঙ্গে সখার সম্বন্ধ, মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের, কিংবা বিপরীত, এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ। স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালোবাসেন ভগবানকে তেমন ক'রে ভালোবাসতে পারাটা মনুষ্যজীবনে প্রেম-সাধনার চূড়ান্ত সাধনা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজের গোপবালার প্রেম ছিল তেমনি, যদিও সেই প্রেমে কোনো কামগন্ধ ছিল না। বৈষ্ণবরা বলে থাকেন, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কাম না-হ'তে পারলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উপলব্ধি করা কোনো রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠেও তাঁরা সাধারণ লোককে নিষেধ করেন, কেননা সাধারণ লোকেরা রিপুর প্রকোপে আচ্ছন্ন। এই বৈষ্ণবীয় প্রেম উপলব্ধি করবার জন্য রামকৃষ্ণ স্ত্রীলোকের বসনভূষণে সজ্জিত হ'য়ে নিজেকে স্ত্রীলোক ভেবে নিয়ে কিছুদিন ভাবসাধনায় মগ্ন রইলেন, অবশেষে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হলো। সমাধি অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের মনোরম প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি তৃপ্ত হলেন। বৈষ্ণব ধর্মের পর তিনি একে-একে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের, এমন কি মুসলমান ধর্মের, অতলে অবগাহন করবার জন্য সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করেন এবং

অবিশ্বাস্য অত্যল্প সময়ের মধ্যে সর্ব ধর্মের গভীরতম তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। কোনো ধর্মমত বা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যখনই তাঁর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা জাগতো অমনি দেখা যেত সেই-সেই ধর্মাবলম্বীর কোনো না কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সাহায্যকল্পে নির্ঘাত উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর জীবনের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীর মধ্যে এ-ও একটি দৃষ্টান্ত। এগুলোকে চমৎকার সমাপতন যেমন বলা যায় তেমনি আশ্চর্য ঘটনা বলেও অভিহিত করা যেতে পারে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

আরো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ঐ সময়ে একদিন তিনি মন্দিরের উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে, বিরাট পঞ্চবটীর নিচে বসে আছেন, অন্তরে ধর্মের মর্মমূল জানবার ব্যাকুলতা। পঞ্চবটীর নির্জন স্থানটিকে তাঁর ধর্মসাধনার উপযুক্ত ও নির্বিঘ্ন স্থান বলে মনে হলো। এখানে তিনি ছোট্টো একটি খড়ের কুঁড়ে ঘর বানাবেন ভাবছেন এমন সময়ে জোয়ারের জলে ভেসে এলো ছোট্টো একটি খড়ের ঘরের সমস্ত উপকরণ—বাঁশ-বাখারি, দড়ি-দড়া প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ—তিনি যেখানে উপবিষ্ট সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজের মধ্যে জোয়ারের জল ঐ সব উপকরণ এনে ফেলে দিয়ে গেল। তিনি প্রসন্ন চিত্তে ওগুলি নিয়ে ঘরামীকে দিয়ে বানিয়ে ফেললেন একটি ছোট্টো কুঁড়ে ঘর। এই ঘরে তিনি যোগ-সাধনা করতেন।

পরবর্তী কালে খৃষ্টধর্ম মতে সাধনা করবার কথা মনে হয়েছিল তাঁর। ভাব সমাধিতে যীশুখৃষ্টকে দর্শন করেছিলেন তিনি এবং তারপর তিন দিন ধ'রে শুধু যীশু ও তাঁর প্রেমের প্রসঙ্গ, এ-ছাড়া বাক্যে-মনে আর কোনো প্রসঙ্গের স্থান ছিল না তাঁর কাছে। তাঁর সকল ভাব-দর্শনের এইটেই বৈশিষ্ট্য যে তিনি যখন তা প্রত্যক্ষ করতেন তখন নিজের সত্তার বাহিরে ঐসব 'দর্শনে'র একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতো কিন্তু বাইরে থেকে অপসৃত হওয়ার পর তাঁর অন্তরে গিয়ে তা প্রবিষ্ট হ'তো। রাম, শিব, কালী, কৃষ্ণ, যীশু এবং অন্যান্য সমস্ত দেব-দেবী বা ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের দর্শনের বেলাও সেই একই ব্যাপার।

এইসব দর্শন ও বিভিন্ন ধর্মোপলব্ধির পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে প্রত্যেক ধর্মই মূলত সত্য, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এক-একটি ধর্ম বা ধর্মমত সেই পরম একের অভিমুখে এক-একটি পথ বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

বৎসরের পর বৎসর ধর্মসাধনার দিনগুলিতে তিনি যে বিবাহিত এ-কথা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়েছিলেন, অবশ্য নিজের শারীরিক অস্তিত্বসুদ্ধ যিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন তাঁর কাছে এটা তেমন অস্বাভাবিকও নয়। কিশোরী বধূটি ইতিমধ্যে সতেরো-আঠারোয় পা দিয়েছেন। তাঁর স্বামী পাগল হয়ে গেছেন এই জনশ্রুতি তিনি শুনেছেন, শুনে গভীর শোক পেয়েছেন। তারপর আবার তাঁর কানে গেল যে তার স্বামী একজন মস্ত ধার্মিক ব্যক্তি। সুতরাং তিনি সংকল্প করলেন, নিজে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তিনি তার বিধিলিপি বুঝে নেবেন। মায়ের অনুমতি পাওয়া গেল, অতঃপর তিনি তিরিশ-চল্লিশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে উপস্থিত হ'লেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে গভীর স্নেহে গ্রহণ করলেন, কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে, পূর্বেকার রামকৃষ্ণের মৃত্যু হ'য়েছে এবং নতুন রামকৃষ্ণ কোনো নারীকেই এখন আর স্ত্রী বলে ভাবতে পারেন না। তিনি বলেছেন, সেই সময়ে তাঁর স্ত্রীর মধ্যেও তিনি দেখতে পেলেন তাঁর জগন্মাতা কালীকে, শত চেষ্টা ক'রেও তিনি আর কিছু দেখতে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন ক'রে পুষ্প চন্দন ধূপ ধূনো দিয়ে পূজো করলেন, মায়ের কাছে সন্তানের মতো তাঁর আশীর্বাদ চাইলেন, তারপর সমস্ত চেতনা হারিয়ে সমাধিস্থ হ'য়ে গেলেন। এই মহানায়কের সুযোগ্য স্ত্রী তিনি, রামকৃষ্ণকে বললেন, স্বামী হিসেবে তাঁর কাছ থেকে কিছুই তিনি চান না, কিন্তু কী ক'রে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায় সেইটে যেন তিনি তাঁকে শিখিয়ে দেন, আর রামকৃষ্ণের কাছাকাছি থেকে তাঁকে রান্না ক'রে খাওয়ানো ও তাঁর স্বাস্থ্য ও সুখ সুবিধার যতটুকু সেবা তিনি করতে পারেন তা থেকে যেন তাকে বঞ্চিত করা না হয়। তদবধি তিনি বরাবর মন্দির প্রাঙ্গণে বসবাস করেছেন এবং স্বামীর প্রদর্শিত পথে সাধনা করে

গেছেন। মথুরানাথ একবার তাকে হাজার দশেক টাকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, কাঞ্চন ও সর্ববিধ ঐহিক সুখকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রে যে স্বামী সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছেন তাঁর অনুগমনে যেহেতু তিনি কৃতসংকল্প সুতরাং অন্য কিছুতে তাঁর আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

এখনো তিনি জীবিত, শুচিশুদ্ধতা ও চারিত্র্য শক্তির জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন। ধর্মসাধনায় সিদ্ধির পথে মেয়েদের তিনি যথাযোগ্য সহায়তা করেন। সাধন পথে তিনি তাঁর স্বামীর উত্তরসাধিকা, তাঁর কাছে তাঁর স্বামী স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার।

রামকৃষ্ণ যদিও প্রথামাফিক লেখাপড়া করেন নি, এমন আশ্চর্য স্মরণশক্তি ছিল তাঁর যে একবার তিনি যা শুনতেন কখনো তা ভুলতেন না। পরবর্তী জীবনে একবার অধ্যাত্ম রামায়ণ শোনবার ইচ্ছা হ'লে তিনি তার কোনো এক শিষ্যকে মূল শ্লোক থেকে পাঠ ক'রে শোনাতে বলেন। তিনি পাঠ শুনছেন এমন সময় তাঁর অপর এক শিষ্য এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন মূল শ্লোকগুলি তিনি বুঝতে পারছেন কিনা। তিনি বললেন, এই পুঁথি তিনি পূর্বে শুনেছেন। এই পুরাণ-পাঠের ব্যাখ্যা তিনি যেভাবে করলেন তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে তিনি আদ্যোপান্ত সবই জানেন। তবে তিনি আবার শুনতে চেয়েছিলেন কেন? না, ভারি চমৎকার এর শ্লোকগুলি। এই বলে তিনি তক্ষুনি পরবর্তী শ্লোকগুলির মর্মার্থ বারংবার বলতে লাগলেন যে-শ্লোক তখনো পাঠ ক'রে শোনানো হয়নি।

যোগের অসাধারণ শক্তির অধিকারী তিনি, কিন্তু কখনো কারো কাছে সেই বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শনের ধার দিয়েও যেতেন না। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, সাধনপথে অগ্রসর হ'লেই এ-সব ক্ষমতা আপনি এসে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই এ-সব ব্যাপারে লোকের কথায় কান দিতেও তিনি তাঁদের বারণ করতেন। তাঁদের সাধনার উদ্দেশ্য তো লোকের

মনোরঞ্জন করা নয়, পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই তাঁদের চরম লক্ষ্য। সিদ্ধাই বরং সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক, কেননা এইসব অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ সাধনার পথে মানুষের মনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। কিন্তু তিনি স্বয়ং যে এ-সকল আশ্চর্য বিভূতির অধিকারী ছিলেন তাঁর কাছে যারা গেছেন তারাই তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পেয়েছেন: অপরের মনে কোন কথার আনাগোনা চলছে কিংবা ভবিষ্যতে কী ঘটবে-না-ঘটবে তা তিনি বলতে পারতেন, দেখতে পেতেন বহু দূরের জিনিস, ইচ্ছামত সারাতে পারতেন যে-কোনো ব্যাধি, এইসব আরো কত কী। এর মধ্যে একটি মহৎ ও আশ্চর্যতম শক্তি প্রায়ই তিনি ব্যবহার করতেন, সেটা হ'লো কারো শরীর স্পর্শমাত্র তার চিন্তার বদল ঘটানো। এই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কারো আবার সমাধি হ'য়ে যেত, সে তখন সমাধি অবস্থায় নানা দেবদেবীর দর্শন পেত, ঘণ্টা কয়েক বাহ্যচেতনা থাকতো না। কারো-কারো মধ্যে এই স্পর্শের ফলশ্রুতি অন্যরকম হ'তো: বাইরে থেকে কোনো বদল না-হ'লেও অন্তরে ভাবনা-চিন্তার একটা নতুন দিগ্‌দেশ ও নতুন প্রেরণা তারা অনুভব করতো যার ফলে ধর্মপথে উন্নতি তাদের ত্বরান্বিত হ'তো। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগী যে সে টের পেত তার মনের গতি-প্রকৃতি আর ভোগ-সুখের দিকে যাচ্ছে না, কৃপণের মালুম হ'তো তার কাঞ্চনপ্রীতি উধাও হ'য়েছে, এমনি আরো কত কী।

এই সময়ে সপরিবার মথুরানাথ তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, সঙ্গে নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণকে। তাঁরা বৃন্দাবন অবধি হিন্দুদের সমস্ত তীর্থ-স্থানগুলো ঘুরে বেড়ালেন। এই সুযোগে রামকৃষ্ণ নানা মন্দির দেখে নিলেন শুধু তাই নয়, এই সব তীর্থস্থানে বসবাস করছেন এমন অনেক ধার্মিক ও সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হ'লো। তাঁদের মধ্যে বারাণসীর তৈলঙ্গ স্বামী ও বৃন্দাবনের গঙ্গামাতার নাম প্রসিদ্ধ। এই সাধুরা রামকৃষ্ণকে উচ্চস্তরের অসাধারণ ব্যক্তি মনে করতেন, শুধু ব্রহ্মজ্ঞ নন, উপরন্তু মস্ত বড়ো ধর্মপ্রবক্তা বা আচার্য এমন কি ঈশ্বরের অবতার বলে তাঁরা রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। বৃন্দাবনের

নিসর্গ শোভা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা মায়ের কথা ভেবে তিনি বাড়ী ফিরে এলেন। ফেরবার পথে বৈদ্যনাথের কাছাকাছি এক গ্রামের দীন-দরিদ্র অবস্থা দেখে তিনি এমন মর্ম-পীড়া অনুভব করলেন যে কেঁদে-কেঁদে অস্থির হ'য়ে পড়লেন, গ্রামের লোকদের সুখী না-দেখা অবধি তিনি বাড়ি ফিরবেন না স্থির হ'লো। সুতরাং সমস্ত গ্রামের লোকদের কয়েকদিন ধ'রে খাওয়ালেন মথুরানাথ, প্রত্যেক গ্রামবাসীকে যথাযোগ্য অর্থ ও বস্ত্র দান করলেন, তারপর রামকৃষ্ণকে প্রসন্ন মনে ফিরিয়ে নিতে পারলেন।

'চারদিকে মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে গোলাপ যখন ফোটে, ঝাঁকে-ঝাঁকে মৌমাছি আসে। এই প্রস্ফুটিত গোলাপকে খুঁজে বেড়ায় মৌমাছিরা, গোলাপ কিন্তু মৌমাছিদের খোঁজে না।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী যে কতদূর সত্য তা বারংবার তাঁর নিজের জীবনেই দেখা গেছে। তাঁর কাছ থেকে জীবনের দিগদেশ নেবার জন্য, জীবনের অফুরন্ত সুধা পান করবার জন্য তাঁর কাছে এসে ভীড় করেছে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে অসংখ্য আগ্রহী মানুষ।

লক্ষ লক্ষ ধর্মাকাঙ্ক্ষী মানুষের মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য উপদেশ ও ধর্মশিক্ষা দানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিয়ত তিনি এত ব্যাপৃত থাকতেন যে খাওয়া-দাওয়ার অবকাশটুকুও তাঁর মিলতো না। অনেক জ্ঞানীগুণী, আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন বড়ো-বড়ো যোগীরাও নানা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য আসতো দক্ষিণেশ্বরের এই নিরক্ষর পরমহংসের কাছে। পরমহংসের আশ্চর্য শুচিতা, শিশুসুলভ সরলতা, নিখুঁত নিঃস্বার্থপরতা এবং ধর্ম ও দর্শনের মহত্তম সত্য উপস্থাপন করতেন তিনি যে ভাষায় সেই সহজ-সরল ভাষা—রামকৃষ্ণের কাছে এসে এই সব দেখেশুনে তাঁরা তাঁকে আধ্যাত্মিক গুরু বলে মেনে নিতেন। কিন্তু যতদিন না কেশবচন্দ্র সেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং লিখলেন তাঁর বিষয়ে, কলকাতার লোকেরা তাঁকে জানতোই না।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ঘটলো কী ভাবে সেটা বলি। সময়টা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ, দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে মাইল ছুয়েকের তফাৎ বেলঘরিয়া, সেখানে এক বাগান-বাড়িতে কেশবচন্দ্র তখন প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। তাঁর কথা শুনলেন রামকৃষ্ণ, তাঁকে দেখতে গেলেন। যে সহজ ও সরল ভাষায় ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম ও দিব্য জ্ঞান ব্যক্ত হ'চ্ছে, রামকৃষ্ণের সেই আশ্চর্য ভাষা শুনে এবং তাঁর ভাবসমাধি দেখে কেশবচন্দ্র এমন অভিভূত হ'লেন যে এরপর থেকে তিনি প্রায়ই রামকৃষ্ণের কাছে আসতে লাগলেন। রামকৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে এই আশ্চর্য মানুষের আশ্চর্য বাণী ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহানন্দে শুনতেন। কথা বলতে বলতে রামকৃষ্ণের যখন-তখন সমাধি-হ'তো, নিজেকে শুচি-শুদ্ধ করবার জন্য কেশব তখন আলতোভাবে তাঁর পাদস্পর্শ করতেন। পরমহংসকে তিনি মাঝে-মাঝে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন, কখনো-কখনো নৌকোয় তুলে নিয়ে গঙ্গার উপর কয়েক মাইল বেড়াতেন। ধর্মের যে-সব বিষয়ে তাঁর নিজের মনে সংশয় আছে সেই সব বিষয় তিনি রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নিতেন। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে এক প্রবল ও গভীর ভালোবাসার সৃষ্টি হ'লো, কেশবের সমস্ত জীবন বদলে গেল। তারপর কয়েক বছর পরেই 'নব-বিধান' নামে তাঁর নতুন ধর্মমত ঘোষণা করলেন। এই নব-বিধান আর কিছুই নয়, দীর্ঘকাল রামকৃষ্ণের কাছে তিনি যে-ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলেন সেই সত্যেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র।

রামকৃষ্ণের ধর্মশিক্ষা ও কথামৃতের যে-সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করলেন কেশবচন্দ্র তাতে পরমহংসের প্রতি আগ্রহের ব্যাপক আলোড়ন জাগ্রত হলো, এই যোগীবরের মুখনিঃসৃত উপদেশ শোনবার জন্য কলকাতার উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে এসে উপস্থিত হ'লেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তিনি তাদের সঙ্গে নানা কথা বলতেন, ধর্মোপদেশ দিতেন। রাত্রেও তাঁর বিশ্রাম ছিল না, কেননা কোনো-কোনো অতি আগ্রহী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে

থেকে যেতেন। তখন তাঁর ঘুম থাকতো না, জ্ঞান-ভক্তি বিষয়ে নানা কথা ও নিজের অভিজ্ঞতার নানা কাহিনী তিনি সারা রাত্রি ধ'রে তাদের বলতেন। যদিও তাঁকে এই একটানা অবিরাম ঝক্কি পোয়াতে হ'তো তবু তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতেন না। ইতিমধ্যে দিনে দিনে স্ত্রী-পুরুষের ভিড় বাড়তে লাগলো, তিনিও সমান তালে এগিয়ে চললেন। যদি তাঁকে বিশ্রাম গ্রহণে চাপ দেওয়া হ'তো তিনি বলতেন, 'যদি একটি মানুষেরও বন্ধন মোচন করতে পারি তবে আমি শত সহস্রগুণ শারীরিক যন্ত্রণা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে রাজী আছি।'

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কণ্ঠনালীর প্রদাহ বা ফ্যারিঞ্জাইটিস রোগে পড়লেন, এই রোগ ক্রমে ক্রমে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হ'লো। কলকাতায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'লো, বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপর তাঁর চিকিৎসার ভার ন্যস্ত করা হ'লো। একদম কথা বলতে বারণ করলেন তাঁরা, কিন্তু বৃথা। যেখানেই তিনি যান সেখানেই স্ত্রী-পুরুষের ভিড়, তাঁর মুখনিঃসৃত একটি বাণী শোনবার জন্য তারা ধীরভাবে প্রতীক্ষা করে, তাদের প্রতি করুণায় তিনিও চুপ ক'রে বসে থাকতে পারেন না। মাঝে-মাঝে তাঁর ভাবসমাধি হ'য়ে যেত, তখন তাঁর ব্যাধির বা শরীরের কোনো বোধ থাকতো না, সমাধির পর আবার তিনি অনর্গল কথা বলতেন। এমন কি কণ্ঠনালীর সংকোচনের ফলে যখন তিনি তরল খাদ্যও গলাধঃকরণ করতে পারতেন না, তখনও তিনি থামতেন না, কথা বলতে চেষ্টা করতেন। নিয়ত নির্ভয়, সদা প্রফুল্ল তিনি, ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রাত্রি দশটায় সমাধিস্থ হ'লেন, সেই মহাসমাধি আর ভাঙলো না। তাঁর শিষ্যবর্গ প্রথমে এই সমাধিকে তাঁর প্রাত্যহিক সাধারণ সমাধি মনে করলো, সেরা সেরা চিকিৎসকেরাও তাঁর হৃৎস্পন্দন অনুভব করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, কিন্তু হায়, তিনি আর ফিরলেন না।

রৌপ্য বা কাঞ্চনে রামকৃষ্ণের বিতৃষ্ণা এতই প্রবল ছিল যে তিনি তা স্পর্শ করতেও পারতেন না, এমন কি ঘুমের মধ্যেও সামান্যতম কাঞ্চনস্পর্শে তাঁর সমস্ত শরীর বেঁকে কুঁকড়ে যেত। নিশ্বাস থেমে গিয়ে হাতের আঙুলগুলো কুঁকড়ে কয়েক মিনিট অসাড় হয়ে থাকতো, রৌপ্যকাঞ্চন সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ অবধি ঐ একই অবস্থা। পরবর্তী জীবনে তিনি কোনো ধাতব পদার্থ, এমন কি লোহার জিনিসও, স্পর্শ করতে পারতেন না।

মানব ও দেবতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিলেন তিনি। সাধারণ অবস্থায় তিনি কথা বলতেন যেন মেয়ে-পুরুষ সকলের সেবক তিনি। তাদের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে দেখতেন। গুরু বা আচার্য বলে তাঁকে কেউ সম্বোধন করুক এটা তিনি চাইতেন না। কোনো উচ্চ আসনও দাবি করেননি কখনো। যে মাটির উপর দিয়ে তাঁর শিষ্যরা হেঁটে গেছেন তিনি শ্রদ্ধাভরে স্পর্শ করতেন সে মাটির ধুলো। কিন্তু ওদিকে আবার যখন-তখন ঈশ্বর-চেতনায় আক্রান্ত হ'য়ে পড়তেন। তখন তিনি একেবারে আলাদা মানুষ। তখন তাঁর বাক্যে মনে হতো তিনি সর্বকর্মপারঙ্গম ও সর্বজ্ঞ। যেন তিনি কল্পতরু। যেন যীশু, বুদ্ধ, ত্রেতাযুগের রাম আর দ্বাপরের কৃষ্ণ—সব মিলে রামকৃষ্ণ। বহু পূর্বে, তখনও তাঁর কথা কেউ জানেন না, তিনি মথুরানাথকে বলেছিলেন, খুব শিগগির অনেক শিষ্য আসবেন তাঁর কাছে এবং তিনি তাদের প্রত্যেককে চেনেন। বলেছিলেন, তিনি কালের অতীত, মুক্ত পুরুষ, এবং ধর্মের নিমিত্ত তিনি যা-কিছু কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন সবই লোকশিক্ষার জন্য, মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য। সকলের কল্যাণের জন্য তাঁর একক সাধনা।' তিনি বলেছেন, তিনি নিত্যমুক্ত, স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার। 'কুমড়োর ফল হয় আগে'—বলেছিলেন তিনি—'তারপর ফুল। নিত্যমুক্ত যাঁরা তারাও তেমনি, তারা তো মুক্ত হ'য়েই আছেন, কিন্তু জীবের কল্যাণের জন্য মর্ত্যলোকে নেমে আসেন।'

সমাধি অবস্থায় রামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে বা বাহ্যজগত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

অচেতন থাকতেন। একবার তিনি এই অবস্থায় জলন্ত কয়লার উপর পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর অঙ্গ গভীরভাবে দগ্ধ হ'লেও কয়েক ঘণ্টা তিনি তা জানতেই পারেন নি। সার্জন এসে অঙ্গার বের করবার সময়ে তাঁর চেতনা ফিরে এলো, তখন তিনি দগ্ধ অঙ্গের যন্ত্রণা অনুভব করলেন।

আরেকবার পা পিছলে তাঁর হাত ভাঙলো। সার্জন এসে হাত বেঁধে দিয়ে বলে গেলেন, সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া অবধি ঐ হাত দিয়ে কিছু করা চলবে না। কিন্তু তা অসম্ভব। ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কেউ কোনো কথা তুললেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন, তাঁর হাত দু'খানা ঋজু ও শক্ত হ'য়ে যেত, তখন ভগ্ন ও আহত হাতখানাকে পুনরায় বেঁধে দিতে হ'তো। মাসের পর মাস এই চললো, ফলে হাড়ের সামান্য ভাঙন জোড়া লাগতে মাস ছয়েক কাটলো।

বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তিসহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটি তাঁর নামে হস্তান্তরের প্রস্তাব মথুরানাথ বারংবার যখন আনতে লাগলেন, রামকৃষ্ণ সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান তো করলেনই, উপরন্তু বললেন যে, মথুরানাথ এ প্রস্তাব পুনরায় করলে তিনি, দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবেন। আরেক সময় অন্য এক ভদ্রমহোদয় প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকা দান করতে চেয়েছিলেন, ফল যথাপূর্বং।

রামকৃষ্ণজীবন প্রসঙ্গে মন্তব্য

রামকৃষ্ণের জীবনের এই বিবরণ বিবেকানন্দ আমাকে পাঠিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি যা জেনেছেন তাঁর স্মৃতি থেকে যাবতীয় সমস্ত বিষয় উদ্ধার করে এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে আমাকে লিখে জানাতে আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। আমি তাঁকে বারংবার সতর্ক করে দিয়েছিলাম, তাঁর গুরুর সম্বন্ধে যে-সকল কাল্পনিক কাহিনী কয়েকটি ভারতীয় সাময়িক পত্রে আমি দেখেছি তা যেন তিনি আমাকে না পাঠান। আমার বিশ্বাস, তিনি আমার বক্তব্য পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন। তথাপি ইতিহাসের ঊষালগ্নে ক্রিয়াশীল সংলাপ-প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক সম্মার্জন কার্যও আমরা লক্ষ্য না-করে পারি না। দেহান্তরিত গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রসূত এই বিবরণে প্রতিকূল পট-ভূমিকায় গুরুকে উপস্থাপিত করার সম্ভাবনা আছে এমন কোনো উপাদান অনুপস্থিত, এ-ক্ষেত্রে সে-রকম কিছু বিশ্বাস করতে বা তার পুনরুল্লেখ করতে স্বাভাবিক অনিচ্ছা ও অসামর্থ্যের ভাবটিও বিদ্যমান। তাছাড়া, এই বিবরণ লেখা হয় তাঁর গুরুর তিরোভাবের পর, এবং 'মৃতের শুধু গুণকীর্তন করো' এই মনোভাব প্রত্যেক মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল। ক্ষুদ্র গ্রাম্য সংকীর্ণতার মধ্যে কারো সম্বন্ধে যখন সকলে মিলে, প্রধানত তাঁর বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহীর দল কোন বিষয়ে বলাবলি করে ও সেটাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেয় তখন সম্ভবত তাঁর বিপক্ষে কোনো কথা ওঠে না। এবং যদি কখনো কোনো লোক সাধারণের চেয়ে স্বতন্ত্র বলে গণ্য হয়, যদি ঐ ব্যক্তিকে মনে করা হয় অতিমানবীয় ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তখন বিষয়টাকে পাকাপাকিভাবে সমর্থন জানাতে আরো কেউ-কেউ এগিয়ে আসে নতুন কথার যোগান নিয়ে। তখন কারো মনে সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না, কেননা সংশয় বা অস্বীকার করলে সেটা

ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা নির্দয়তার অভিজ্ঞান বলে গণ্য হয়। যেমন ধরা যাক্ ব্রাহ্মণীর কাহিনী—সেই যে ব্রাহ্মণী যিনি রামকৃষ্ণের যোগশিক্ষক ও বার্তাবহরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন—তাঁর কাহিনী আমাদের কাছে সম্ভাব্য বলে মনে হয় না। পরন্তু আমি যখন প্রথম এঁর কথা শুনি তখন ইনি চিত্রিত হয়েছিলেন কোনো দেবী বা সরস্বতীরূপে, অরণ্যে গিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যকে বেদ-পুরাণ আর দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আসল ব্যাপারটা অবশ্য এই যে, যাকে বলা হয় 'ক্ল্যাসিকাল এজুকেশন' অর্থাৎ শাস্ত্র-পুরাণের চিরায়ত বিদ্যাশিক্ষা, রামকৃষ্ণের তা অধিগত ছিল না অথচ তিনি প্রাধিকার বলে, তাঁর দেশের লোকদের এই সব প্রাচীন ধর্ম ও শাস্ত্র-পুরাণের বিষয়ে উচ্চাঙ্গের কথা বলতেন, এবং এই সমস্যার সমাধান-কল্পে ব্রাহ্মণীর ঐ দিব্য আবির্ভাবের প্রয়োজন হ'লো। রামকৃষ্ণ যে সংস্কৃতসাহিত্যে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন, এমন কি ভারতের এই দেবভাষার একটি বর্ণও যে তিনি জানতেন না, এই সত্য কেউই অস্বীকার করেন না, উপরন্তু এ-কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে ও মুক্তকণ্ঠে বলেছেন রেভারেণ্ড পি, সি, মজুমদার, যিনি রামকৃষ্ণেরই একজন মস্ত বড়ো গুণগ্রাহী। রামকৃষ্ণ বাংলা জানতেন অবশ্যই, এবং বাংলা ভাষায় কথা বলেন এমন লোকের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার অর্থ আন্দাজ করা একজন ইতালীয়ের পক্ষে ল্যাটিন ভাষা আন্দাজ করার মতই সহজসাধ্য। সংস্কৃত শাস্ত্র-পুরাণের কোনো কোনো মূল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ আছে, হয়তো তা থেকে তিনি তাঁর ঈপ্সিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন। বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার কথা না বললেও চলে, তাঁর প্রশ্নাবলীর যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে তাঁরা নানা বিষয়ে তাঁর ভ্রম সংশোধন ক'রে থাকবেন। এইরূপে দেখা যায় যে 'কলের ভগবানের চাতুরী' এমনি ভাবে ফাঁস হ'য়ে যাবে সেটা বাস্তবিকপক্ষে উদ্দেশ্য ছিল না। ঐ ব্রাহ্মণীকে যদি 'দেবী' বলে অভিহিত করা হয়, তাহ'লে আমরা মনে না-ক'রে পারি না, 'সম্ভ্রান্ত ঘরের বিদুষী মহিলাদের নামের সঙ্গে যে-দেবী পদবী যুক্ত করা হ'য়ে থাকে ব্রাহ্মণীর 'দেবী'

পদবী তার চেয়ে বেশি কিছু না। নানা শাস্ত্র ও নানা তথ্য অর্জন করেছেন এমন কোনো আশ্চর্য বিদুষী ভদ্রমহিলাকে দেবী সরস্বতীর প্রতিমূর্তি বলে অভিহিত করা হ'য়েছে এমনও হতে পারে। ভারতবর্ষে মানবের সঙ্গে দেববিগ্রহের ব্যবধান দুস্তর নয়; সেখানে দেবতা মানুষ ও মানুষ দেবতা হতে পারে বলে বিশ্বাস আছে, এবং এ-বিশ্বাস নিয়ে কোনো হৈ চৈ হয় না।

মজুমদারের বিচার

রামকৃষ্ণের ভক্ত-শিষ্য বিবেকানন্দের সাক্ষ্য পক্ষপাতদুষ্ট বলে সন্দেহ করা যেতে পারে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা কেবল বিবেকা-নন্দের সাক্ষ্যপ্রমাণই পাইনি, উপরন্ত আমাদের হাতে আরো অনেক অপক্ষপাত সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যা আমাদের প্রসঙ্গের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দাঁড়ায়। *মজুমদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ অবশ্যই অনুকূল। রাম-কৃষ্ণের শিষ্যবর্গের প্রচারকার্য বিষয়ে তিনি উদাসীন, কিন্তু রামকৃষ্ণের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উচ্চগ্রামে বাঁধা। আমাকে লেখা তাঁর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে তিনি লিখছেন: "কেশবচন্দ্রের জীবন ও বাণী' নামক গ্রন্থে এবং পুরনো 'থিয়িস্টিক রিভিয়ু' পত্রিকায় আমি সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি ও তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা অকপটে ও অন্তরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছি। কিন্তু তাঁর চরিত্রের আরো একটি দিক ছিল, যেটা শিক্ষাপ্রদ নয় বলে কেউ গ্রহণ করতে পারে নি।" এই উক্তিতে আমরা সংলাপ-প্রক্রিয়ার আরো একটি মৌল উপাদানের সাক্ষাৎ পাই।

---

* প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

রামকৃষ্ণের ভাষা

রামকৃষ্ণের ভাষা কখনো-কখনো অত্যন্ত অশ্লীল। তৎসত্ত্বেও, তোমরা যেমন বলো, তিনি প্রকৃতই একজন মহাত্মা, আমিও সেই সম্বন্ধে তাঁর প্রশস্তি করে যা লিখেছি তার একটি শব্দও প্রত্যাহার করবো না। রামকৃষ্ণ বিন্দুমাত্র বৈদান্তিক ছিলেন না, ব্যতিক্রম শুধু এই যে প্রত্যেক হিন্দুই অজ্ঞাতসারে তার চারপাশের প্রতিবেশ থেকে কিছু পরিমাণ বেদান্তবাদ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ ক'রে থাকে। এটা প্রত্যেক জাতীয় ধর্মবিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি। তিনি সংস্কৃতের একটি বর্ণও জানতেন না, সন্দেহ হয় তিনি বাংলা ভাষাটা যথেষ্ট পরিমাণে জানতেন কিনা। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা, ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর।

এই বিষয়ে একটি অপক্ষপাত ও সত্যের পরিমণ্ডল আছে এবং সেই সূত্রে জানা যায়, এমন কি ভারতবর্ষেও ধর্মসংস্কারক ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে যে-ঈর্ষার মনোভাব প্রায়ই প্রকট হয় তাঁর মধ্যে সে-ঈর্ষার লেশমাত্রও ছিল না। তাঁর অশ্লীল উক্তির বিষয়ে বলা যায় যে প্রাচ্য জাতির অনাড়ম্বর ও সরল ভাষার সম্মুখীন হবার জন্য আমাদের প্রস্তুতির প্রয়োজন। যে-দেশে এক শ্রেণীর লোক উন্মুক্ত লোকালয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, সেখানকার ভাষার ক্ষেত্রেও আমাদের মতো রাখা-ঢাকার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য খোলাখুলি অশ্লীল ও তাৎপর্যগত অশালীনতায় অনেক তফাৎ। 'জোলা' প্রমুখ লেখকদের বিরুদ্ধে যে ইচ্ছাকৃত অশ্লীলতা বা অশোভনতার অভিযোগ উত্থাপিত হ'য়ে থাকে সে-রকম কোনো অভিযোগ রামকৃষ্ণের ব্যাপারে কখনো আনা হ'য়েছে বা হতে পারে কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে! এটা খুবই সত্য যে, জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ না-হলেও যে-সব হিন্দু সামাজিক দিক থেকে উচ্চ

শ্রেণীর মহাশয় ব্যক্তি তাঁরা তাঁদের ভাষা ব্যবহারে খুবই সতর্ক। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁদের বন্ধুদের রচনায় আমরা তেমন কোনো রুচিহীনতার পরিচয় পাই না। কিন্তু সরাসরি বা প্রত্যক্ষ উক্তি ইংল্যাণ্ডে যেমন নিন্দনীয় ভারতবর্ষে যে তেমন নয় সেটা সুস্পষ্ট, এবং পণ্ডিত মাত্রেই জানেন যে, সেখানকার চিরায়ত কাব্য বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থে এমন সব অনুচ্ছেদ আছে যা তর্জমার সাহায্যে ইংরেজিতে আমদানীর যোগ্য নয়। ভর্তৃহরির তিন 'শতকে' যে সাংসারিক জ্ঞান, প্রেম ও ঔদাসীন্যের কথা, বিশেষত প্রেম বিষয়ক যে কথা বলা হয়েছে, সাধারণভাবে ইংরেজী তর্জমা থেকে তা বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু 'শৃঙ্গার-শতকে'র প্রাণবস্তু জোলার উপন্যাসে কোনো ক্রমেই পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে অবশ্য কবির উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বিরুদ্ধে লোককে সতর্ক করা, ভারতীয় আদর্শানুযায়ী পাপ বলে নয় পরন্তু এই ইন্দ্রিয়চর্চা মনের স্থিরতা অর্জনের প্রতিবন্ধক বলে। মনের স্থিরতা না এলে জীবনের যে মহত্তম লক্ষ্য নির্লিপ্ত চিত্তের প্রশান্তি ও নির্মূল দৃষ্টি তা কখনো লাভ করা যায় না। এই তিনটি 'শতকের' একটি প্রয়োজনীয় ইংরাজী সংস্করণ ১৮৯৬ সনে বোম্বে থেকে পুরোহিত গোপীনাথ, এম-এ, মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হ'য়েছে।

এ কথা ভুললে চলবে না যে হোমার বা শেকস্‌পিয়রে, এমন কি বাইবেলে, এমন সব উক্তি আছে আমাদের আধুনিক রুচি যা দেখে ক্ষুব্ধ হয়। তথাপি পরিবর্তিত সংস্করণগুলিতে আমরা আপত্তি না জ'নিয়ে পারি না এই কারণে যে, যে সকল উক্তির আপাত-অশোভনতা স্বেচ্ছাকৃত ছিলো না সেগুলিকে সরিয়ে দিয়ে আমরা পরোক্ষে ঐ অশোভনতাকেই গুরুত্ব দিই।

মজুমদার হয়তো রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ প্রমাণিত সত্য বলে মনে করেন। সেটি হলো, স্ত্রীর প্রতি রামকৃষ্ণের নিষ্ঠুর ব্যবহার। তিনি সুস্পষ্টরূপে এই কথাই বলতে চান যে, রামকৃষ্ণের স্ত্রী সতেরোয় পা দেবার আগে রামকৃষ্ণ তাঁকে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সামাজিক রীতি-নীতির স্বীকৃত সত্য এই যে পাঁচ বছরের বালিকাকে বিয়ে ক'রে স্ত্রীকে তার পিতৃগৃহে রেখে দেওয়া হতো, তারপর বহু বৎসর পর স্ত্রী স্বামীগৃহে যাত্রা করতেন। আবার যে অবস্থায় রামকৃষ্ণ ছিলেন বলে বর্ণনা করা হ'য়েছে সেই অবস্থায় কোনো মানুষ যে 'বিবাহিত স্বামী'রূপে জীবনযাপন করতে অস্বীকার করবে সেটাও প্রাচ্য দেশে, পাশ্চাত্যের বহু দেশেও, খুব একটা অস্বাভাবিক বলে গণ্য হয় না।

বিবেকানন্দ বলেছেন যে, রামকৃষ্ণ পত্নী সতেরো বৎসর বয়সে স্বামী দর্শনে গেলে রামকৃষ্ণ তাঁকে আন্তরিক স্নেহের সঙ্গে বরণ করেছিলেন, তিনিও রামকৃষ্ণের শর্তানুযায়ী তাঁর সঙ্গে বসবাস করতে পেরে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হ'য়েছিলেন এই কথা ভেবে যে, স্বামী তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত ক'রে তাঁকে ভগবানের সেবায় উদ্বুদ্ধ করবেন। স্বামী স্ত্রীর এই সম্বন্ধের কোনো নজীর নেই তা নয়, এই সম্বন্ধকে নিষ্ঠুরও বলা যায় না, কেননা স্বেচ্ছাব্রতের দুঃখ নেই। অল্প দিন পূর্বে আমি জনৈক মার্কিন মহিলার কাছ থেকে একটি ভারি অদ্ভুত পত্র পেয়েছি। এই মহিলা একজন প্রখ্যাত বেহালাবাদকের বিধবা পত্নী মিসেস এস. সি. ওল্‌বুল। কিছুদিন পূর্বে তিনি রামকৃষ্ণের বিধবা পত্নীকে দেখতে গিয়ে ভারতবর্ষের ধর্মান্দোলনে মুগ্ধ হন। শ্রীনগর থেকে তিনি লিখছেন "রামকৃষ্ণের বিধবা স্ত্রী সারদা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি যে সব বিদেশীদের প্রথম দেওয়া হ'য়েছিল আমরা তাদেরই অন্যতম।

সারদা দেবী আমাদের তাঁর সন্তান বলে সম্বোধন ক'রে বললেন যে, আমাদের তাঁকে দর্শন করতে আসা ঈশ্বরেরই অনুগ্রহ ; বললেন, আমাদের তিনি বিদেশী বলে অনুভব করেন না। গুরু, যিনি তাঁর কাছে স্বামী রূপে ছিলেন—সেই গুরুর প্রতি বাধ্যবাধকতা ও তাঁকে মান্য করার রীতি কী সে-কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে অনুরোধ করা হ'লে তিনি বললেন : যখন কেউ গুরু নির্বাচন করেন তখন তার আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত, কিন্তু পার্থিব ব্যাপারে নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে সে গুরু-সেবা করতে পারে, এমন কি কখনো কখনো এদিক থেকে গুরুর সঙ্গে মতান্তর হলেও।

"যে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বাল্যবিবাহ হয়েছিল তাঁকে তিনি যখন সানন্দে তাঁর সন্ন্যাসী জীবনযাপনের সম্মতি দিলেন, অমনি পেলেন তাঁর অন্তরঙ্গতা। তিনি তাঁর শিষ্যা হ'য়ে প্রাত্যহিক নির্দেশ গ্রহণ করতে লাগলেন। যতদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে কাটিয়েছেন, ছিলেন স্বামীর পরামর্শ-দাতা সচিব। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর কাতর প্রার্থনা—স্বামীকে নিবেদনের জন্য কায়মনোবাক্যে শুচিশুদ্ধ জীবনের প্রার্থনা। তিনি দারিদ্র্য ও শুদ্ধাচারকে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছেন এবং জনয়িত্রীর আনন্দ পরিত্যাগ ক'রে তিনি তাঁর স্বামীর সহযোগে আধ্যাত্মিক দিক থেকে অসংখ্য সন্তানের মা হয়েছেন।"

ভাবতে অবাক লাগে যে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে বসবাস করবার যে সংকল্প রামকৃষ্ণ-পত্নী গ্রহণ করেছিলেন তাকেও মজুমদারের মতো বহুদর্শী ব্যক্তির কাছে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল কিনা। সারদা দেবীর মনে নিশ্চয়ই তা হয়নি, তাঁর স্বামীর তরফে অন্য কোনো নিষ্ঠুরতার কথাও আমি এ-যাবৎ শুনিনি। সারদা দেবী নিজে যদি তাঁর জীবনে পরিতৃপ্ত থাকেন তবে সে বিষয়ে অভিযোগ করবার কার কী অধিকার ? সন্তানোৎপাদন না করলে কি স্বামী-স্ত্রীর প্রেম একটা অসম্ভব ব্যাপার ? হিন্দুদের সততায় আস্থাবান হ'তে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন, পাশ্চাত্ত্যে এসব ব্যাপার সংগতরূপে যতই কেননা অবিশ্বাস্য বলে মনে হোক। সে যাই হোক, রামকৃষ্ণের আধ্যাত্ম বিবাহ সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হয়েছেন এমন একজনকেও আমার জানা নেই।

কেশবচন্দ্র সেনের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব

রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে সত্যিকার সম্বন্ধ কী ছিল তাই নিয়ে বড়ো দুঃখজনক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হ'য়েছে। শিষ্য বলতে অনেক কিছু বোঝায়, যেখানে যার সম্মান প্রাপ্য সেখানে তাকে সম্মান দিতে কেশবচন্দ্র কখনো কুণ্ঠিত ছিলেন না, রামকৃষ্ণ বা যে-কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে যদি কখনো কোনো প্রেরণা, উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করেছেন তাঁকেই গুরু বা আচার্য বলে নিয়েছেন, কেশবচন্দ্র ছিলেন তেমনই ব্যক্তি। "সে যেই হোক না কেন"—তিনি লিখছেন—''আমি সকল লোকের কাছে শিক্ষা পেতে চাই। যদি কোনো সাধারণ বাউলকে দেখি, ইচ্ছা হয় তার পায়ের কাছে বসে শিখি। কখনো কোনো সন্ন্যাসী এলে মনে হয় লাখ খানেক টাকা ঘরে এলো। তাঁর স্তবপাঠ শুনে আমি অনেক কথা জানতে পারি। যখন কোনো সন্ত আমার কাছ থেকে বিদায় নেন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি, তিনি তাঁর ধর্মসম্পদ আমার হৃদয়ে ঢেলে দিয়ে গেছেন। কতক পরিমাণে আমি তাঁর মতোই হ'য়ে যাই—আমি আজন্ম ভক্তশিষ্য।" অপরপক্ষে, রামকৃষ্ণের মতো অপর আর কেউ গুরু বা আচার্য পদবীকে এমন দৃঢ়স্বরে বর্জন করেন নি। কেশবচন্দ্র সেন, মজুমদার ও অন্যান্য ভক্ত-শিষ্যদের উপর রামকৃষ্ণের যে দিব্যশক্তি প্রয়োগের কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সে-সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের কোনো এক আত্মীয় স্পষ্টতই সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হ'য়ে কেশবের অগ্রগণ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় উদগ্রীব হ'য়ে পড়েছেন, যেন ধর্ম বা দার্শনিক সত্যের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যের বলে কিছু গ্রাহ্য হ'তে পারে! তার মতে 'কেশবচন্দ্রই সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম রামকৃষ্ণকে ছায়ান্ধকার থেকে নিয়ে এসে সাধারণ্যে প্রকাশ করেন।' হ'তে পারে,

কিন্তু গুরুর প্রকাশের ক্ষেত্রে শিষ্যবর্গ কতবার উপায়স্বরূপ হিসেবে গণ্য হ'য়েছেন? উক্ত ভদ্রলোক তারপর রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, যা সত্য হ'তে পারে, না-ও পারে, কিন্তু কেশব ও রামকৃষ্ণের সম্পর্কের বিষয়ে সে-সব অভিযোগ কোনো কাজেই আসে না। রামকৃষ্ণ নৈতিক দিক থেকে গণিকাদের যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা প্রদর্শন করেন নি, এই বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহ'লে বলতে হয় ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে এ-ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণই একমাত্র নন। 'পাশ্চাত্যের মতানুযায়ী মাদকবর্জন নীতিকে সম্মানপ্রদর্শন' যদি তিনি না-ই ক'রে থাকেন, এমন কেউ আমার জানার মধ্যে নেই যিনি তাঁর অত্যধিক মদ্যপানের অভিযোগ তুলেছেন কখনো। এই ধরনের নিষ্কারণ ছিদ্রান্বেষণ ও কলহবৃত্তি কেশবচন্দ্র সেন এবং রামকৃষ্ণ উভয়ের কাছেই অতিশয় অরুচিকর বলে মনে হ'তো। উভয়ের মধ্যে যে-বাক্য বিনিময় হ'তো তা ছিল পরস্পরের প্রতি স্তুতি ও ভালোবাসার ভাষা, এবং এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে তাঁদের উভয়ের ভিতরের সম্পর্কটাকে ঈর্ষার মনোভাব নিয়ে দেখবার ফলে সম্পূর্ণ বিকৃত রূপে দেখানো হ'য়েছে। আমি বেশ ভালো ক'রেই বুঝতে পারি যে, ভারতবর্ষে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ এক বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কেশবচন্দ্রের কোনো এক আত্মীয়কে কেন কেশবের গুরুরূপে রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করতে হ'য়েছে। কেশবের আসল গুরু বলতে কেউ ছিলেন না, তিনি রামকৃষ্ণের মতো জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণও ছিলেন না। কিন্তু তিনি, এবং মজুমদার, যে রামকৃষ্ণের কাছে থেকে ধর্মশিক্ষা লাভ করেছিলেন সে-কথা তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন। আমার দিক থেকে বলতে পারি যে, কেশবচন্দ্র সেনের আত্মীয়বর্গের চেয়ে আমার কাছে তাঁর স্মৃতিকথা অধিকতর অক্ষুণ্ণ। যখন তাঁর নিকটতম বন্ধুরা তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে তাঁর বিপক্ষে চলে গিয়েছিল, আমি তাঁর স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। ভারতবর্ষে আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা হ'তে পারে এই আশংকায় আমি সানন্দে আমার বক্তব্য এই ভাবে বলতে চাই যে, রামকৃষ্ণও কেশবচন্দ্র

সেনের গুরু হবার ভান করেননি, শিষ্য হিসেবে কেশবচন্দ্রও নন। একমাত্র যে-কথাটা জানতে আমি উৎসুক সেটা এই যে, কেশবচন্দ্রের মধ্যে সঞ্চালিত রামকৃষ্ণের দিব্য শক্তি কেশবচন্দ্রের পরবর্তী আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের বিশেষ কোনো, এ-যাবৎ অব্যাখ্যাত, ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীলরূপে গণ্য হয়েছিল কিনা। মজুমদারের উক্তি অনুধাবন করলে কেশবচন্দ্রের সত্যিকার বিচার সহজসাধ্য হতো। মজুমদার বলেছেন যে, 'ঈশ্বরের মাতৃরূপ, এই ধারণা রামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের ফলেই উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল।—' তাছাড়া তিনি আরো বলেছিলেন, 'রামকৃষ্ণের স্ব-ভাবের আশ্চর্য নির্বাচনী ক্ষমতা কেশবচন্দ্রের গুণগ্রাহী মনকে এই ইংগিত দিয়েছিল যে, যার-যার স্বভাবছন্দের মধ্যে থেকেই আধ্যাত্মিক পরিধি ক্রমশ বিস্তারলাভ করে।' জীবনের শেষ পর্যায়ে কেশবের কথাবার্তায় দিব্য উল্লাসের ছোঁয়া লেগে তিনি কিছুটা 'মিস্টিক' বা অতীন্দ্রিয় হ'য়ে পড়েছিলেন কিনা, ঈশ্বরকে দিব্য মাতৃরূপে ধারণা করবার প্রেরণা তিনি রামকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিনা, এ সবের বিচার আমি সানন্দে অন্যের হাতে ছেড়ে দেব। বাংলায় তর্জমা করলে 'মিস্টিক' ও 'এক্সটাটিক' শব্দদ্বয়ের যে অর্থই হোক না, ইংরেজিতে এর অর্থ যথার্থরূপে সেই শক্তির প্রকাশকেই বোঝায়, তথাকথিত 'নব বিধানের' সমস্ত বচনের মধ্যে যা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে—এবং কেশবের ইওরোপীয় গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা যে-বিষয়ে কঠোর, অত্যন্ত কঠোর, সমালোচনা করেছেন। মিস্টিক শব্দের অনুরূপ শব্দ বাংলায় যেমন, ইংরেজিতে মিষ্টিক শব্দের অর্থ তেমন ভয়াবহ নয়। মনে হয় লোকেরা সর্বদা 'mist' বা কুয়াসার সঙ্গে জড়িয়ে 'মিষ্টিক' শব্দটাকে ভাবে। এইভাবে স্বর্গীয় বি. আর. রঞ্জম্ আয়ার 'প্রবুদ্ধ ভারতে' (পৃঃ ১২৩) লিখেছিলেন; 'মানুষ খাদ্যগ্রহণ না করে যতদিন খুশি জীবন ধারণ করবে, চরাচরে যাকে মৃত্যু বলে সেই অবস্থায় দেহপ্রণালীর প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রাণের ক্ষীণতম স্পন্দন নিয়ে মৃতবৎ কঠিন হ'য়ে অবস্থান করবে—এই যদি হয় বেদান্তের শিক্ষা তাহ'লে বেদান্তকে 'মিস্টিসিজম্' বা অতীন্দ্রিয়বাদের সমর্থক অবশ্যই বলতে হবে। ভানুমতীর অদ্ভুত

অদ্ভুত খেল দেখানো, শরীর ত্যাগ করে ইচ্ছে মতো হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো, ভূতের মতো এখানে ওখানে অবাধে ঘোরাঘুরি, অন্যের শরীরে প্রবিষ্ট হ'য়ে তাতে ভর ক'রে নানাবিধ অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ সংগঠন করা—এই যদি হয় বেদান্তের শিক্ষা তবে তার বিষয়ে ঐ একই কথা বলতে হয়। ঐ একই বিশেষণ তার প্রাপ্য যদি তা মানুষকে কী ক'রে অন্যের মনের কথা পাঠ করতে হয়, কী ক'রে অনন্তকাল সমাধিতে থাকা যায় যে-সমাধি, তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে, জীবন-মৃত্যুর সাধারণ ধারণা থেকে অধিকতর অর্থান্বিত।' 'মিস্টিসিজম্' শব্দটার অপপ্রয়োগ কী ভাবে হ'য়ে থাকে তা দেখাবার জন্য আমি এই উদ্ধৃতি দিলাম, কেননা এগুলোকে জালিয়াতি ও ভোজবাজি ছাড়া মিস্টিসিজম্ নামে অভিহিত করা উচিত নয়। এই উদ্ধৃতির আরো একটি উদ্দেশ্য এই যে, বেদান্ত সম্পর্কে উপরে যা বলা হ'য়েছে রামকৃষ্ণ অথবা কেশবচন্দ্র সেনের চোখে বেদান্ত তা নয়, কস্মিনকালেও ছিল না। এত কথা বলবার কারণ এই যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেশবের তথাকথিত 'নববিধান'-এর শেষ ক্রমপর্যায়গুলো কেশবের সরল ও মৌলিক উপদেশের ক্ষেত্রে আবশ্যিক ছিল না, আমি তাঁর বিভিন্ন উৎস-সন্ধানের প্রয়াস পেয়েছি। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কেউ কেউ যদি আবার আমার এই মন্তব্য থেকে কলহের মূলধন সংগ্রহ করেন, তবে নিশ্চয়ই তা পশ্চাদ্‌নিন্দা ও সংকীর্ণ অসূয়া হিসেবে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করা যেতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানসরাজ্যে যে আন্তরিক আদানপ্রদান কেশবের উচ্চতম আদর্শের অঙ্গীভূত ছিল তার বিস্তৃতি কেশবের নিজের হাতে গড়া সমর্থক-দলের শিশুসুলভ ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা আর সম্ভব নয়। যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বশবর্তী হ'য়ে কেশবের বন্ধুরা আবেগপূর্ণ, যদিও হয়তো সৎ উদ্দেশ্যপ্রসূত ওকালতি ক'রে থাকেন সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনুমোদন আর যে-ই করুক, কেশব নিজে কখনো করতেন না।

বেদান্ত দর্শন

পুনরায় রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এবং এ-প্রসঙ্গে কেশবের উৎসাহী ভক্তকে আমি এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, রামকৃষ্ণকে বেদান্ত-দর্শনের স্রষ্টারূপে আমি কখনো মনে করিনি। বেদান্ত-দর্শনের প্রাচীন রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য আছে এমন ব্যক্তি তিনি ছিলেনই না, কেশবচন্দ্র সেনও যে বেদান্তসূত্রের উপর বিখ্যাত শঙ্করভাষ্য অথবা রামানুজের টীকাভাষ্য অধ্যয়ন করেছেন এমন কথাও আমার মনে হয় না। কিন্তু উভয়েই উক্ত দর্শনের অন্তর্নিহিত শক্তিতে আদ্যোপান্ত রঞ্জিত ছিলেন, যে শক্তি বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম বা দর্শন-উৎসাহী প্রত্যেক হিন্দুর নিশ্বাসের সঙ্গে অল্পবিস্তর মিশে আছে। দর্শন, না ধর্ম? কী বলা যায় বেদান্তকে? বলা শক্ত। হিন্দুর দৃষ্টিতে এ-দুয়ের বাস্তবিক কোন ভেদ নেই।

মজার কথা এই যে, রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেন উভয়ের উক্তিতেই ইউরোপীয় ভাবধারার সংমিশ্রণ বর্তমান। তাঁরা উভয়ে যে ভাবে কথা বলেছেন ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করবার পূর্বে তাঁরা তা বলতে পারতেন না। তাঁদের ধর্মোপদেশের একটি বিরাট অংশ অস্থিমজ্জায় ভারতীয়, নিঃসন্দেহে। এ হ'লো সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শন যাকে সংগতরূপে বেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ বেদান্ত বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু কেশবের রচনায় ইওরোপীয় চিন্তাধারার ছিটেফোঁটা, কখনো-কখনো ছিটেফোঁটার চেয়ে অনেক বেশি, সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। এবং রামকৃষ্ণের বাণীতেও আমরা প্রায়শই অপ্রত্যাশিতরূপে রেলওয়ে বা গ্যাস সুদ্ধ ইওরোপীয় নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ পর্যন্ত দেখতে পাই।

রামকৃষ্ণের উপদেশ-বাণীর অস্থিমজ্জায় যে বেদান্তদর্শন প্রবাহিত তার চরিত্র-নির্দেশের জন্য কিছু বলা প্রয়োজন। ঐ প্রাচীন দর্শনের সংক্ষিপ্ত

সারাৎসার উপস্থাপন করা মোটেও সহজ কর্ম নয়, বিশেষত যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি যে, তিন ভাবে এই দর্শন বরাবর ছিল এবং এখনো আছে : অদ্বৈত মত, বিশিষ্টাদ্বৈত মত এবং দ্বৈত মত। এই শেষোক্ত মতবাদটি, যদিও ন্যূন নয়, বেদান্ত নামের অধিকারী বলে মনে হয় না। অদ্বৈত মতবাদটি প্রধানত শঙ্কর ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা ব্যাখ্যাত। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বচরাচরে সত্য কেবল একটি, তাকে আমরা ঈশ্বর, অনন্ত, নিত্য, অজ্ঞেয় অথবা ব্রহ্ম যাই বলি না কেন—তর্কশাস্ত্রের কূট নিয়ম অনুযায়ী, সুতরাং, যা-কিছু আছে বা আছে বলে মনে হচ্ছে সমস্তই কেবল পরম এক-এরই অভিব্যক্তি, যদিও আমাদের অস্তিত্ববোধ অবিদ্যা বা মায়া দ্বারা বিধৃত। অন্য সব কিছুর মতো মানবাত্মা নিত্য বা পরম ব্রহ্ম ছাড়া আর-কিছুই নয়, আর-কিছুই হতে পারে না, যদিও অবিদ্যা বা মায়ার বশে সে-বিষয়ে ক্ষণেকের জন্য ভ্রান্ত ধারণা হয়ে থাকে। প্রত্যেক জীবাত্মার আকাঙ্ক্ষার অর্থ—সাধারণত যেমন মনে করা হয়—ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন নয়, তাঁর প্রতি অভিগমনও নয়। তার অর্থ কেবল আপন চিরন্তন ও একান্ত সত্তায় ফিরে যাওয়া বা তাকে ফিরে পাওয়া—পরম অখণ্ড ব্রহ্মকে প্রত্যেক প্রতিভাসিক জীবাত্মার চিরন্তন ভূমি হিসেবে চিনে নেওয়া।

দ্বিতীয় মতবাদ অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ সুস্পষ্টত বৃহত্তর জন-সমাজের প্রতি কৃতলক্ষ্য ছিল যে-সমাজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সত্যকে, এবং কেউ কেউ বা আপন স্বতন্ত্র মনের বাস্তবতাকে, অস্বীকার করবার অবস্থায় আসতে পারেনি। এই দুই মতবাদের কোনটি প্রাচীনতর বলা শক্ত। প্রোফেসর থিবাওটের উজ্জ্বল আলোকসম্পাতের পর আমি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বিশিষ্টাদ্বৈতর ব্যাখ্যার সঙ্গে বাদরায়ণ সূত্রের অধিকতর মিল আছে বলে আমার মনে হয়। রামানুজের জীবৎকাল বারো শতকে আর শঙ্করের আট, এ কথা সত্য হ'লেও রামানুজের বহু পূর্বেই বিশিষ্টাদ্বৈতের টীকাভাষ্য সম্বলিত ব্যাখ্যার অস্তিত্ব ছিল। দার্শনিক কূট তর্কযুদ্ধের দিক থেকে অনমনীয় অদ্বৈত মতবাদ অব্যর্থভাবে আমাদের

প্রশংসা অর্জন করে। শঙ্করের পক্ষেও সেই কথা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত কিছুই মূলত স্বয়ংসম্পূর্ণ, অচঞ্চল, অপরিবর্তনীয়, নিত্য ও এক—এই প্রত্যয়ে শঙ্করের সুরু এবং এই প্রত্যয় শেষ পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করেননি। একে তিনি বলেছেন 'ব্রহ্ম', ব্রহ্মের কোনো গুণ নেই 'বিশেষ' নেই, বস্তু ব্যক্তির এবং মননের কোনো গুণাগুণও নেই অথচ অস্তিত্ব ও বুদ্ধি কোনোটিকে বাদ দিয়ে ব্রহ্ম নন। ব্রহ্মকে বর্ণনা করা কিংবা তাঁর সংজ্ঞা নিরুপনের প্রত্যেক প্রচেষ্টার ব্যাপারে শঙ্করের উত্তর একটি—নেতি নেতি। শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই যে অনস্বীকার্য বিচিত্র জগত এবং স্বতন্ত্র সত্তা ও বিষয় সম্বলিত যে-জগত নিয়ত আমাদের চেতনায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, এ-জগতের আদি কারণ কী জিজ্ঞাসা করা হ'লে শঙ্করের কেবল একটি উত্তর: ও-সবের আদি কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। শঙ্করের বেদান্ত-দর্শনের এই আক্রমণযোগ্য কথাটি পাশ্চাত্যমনকে নাড়া দেয়। আমাদের মন বলে, ভালো কথা, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগতের আদি কারণ যদি অবিদ্যা, তবে সে অবিদ্যারও তো আদি কারণ ও সত্তা থাকবে। কিন্তু শঙ্কর সে কথা মানেন না এবং বারংবার বলেন যে মায়ার মতো অজ্ঞানতা বাস্তবও নয়, অবাস্তবও নয়, এটা ঠিক আমাদের ভিতরকার অজ্ঞতার বা ভ্রান্তিরই নামান্তর: যেমন একটা রজ্জুতে আমাদের সর্পভ্রম হতে পারে, এবং ঐ ভ্রমাত্মক গোখরোর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে আমরা তৎপর হই। এই সৃজনশীল অজ্ঞানতাকে একবার মেনে নিলেই সব চুকে গেল, তখন সবই চলবে মসৃণভাবে। অবিদ্যার দৃষ্টিতে পার্থিব জগতের সমস্ত বিষয়ে ব্রহ্মাকে (বা আত্মাকে) রূপান্তরিত বলে মনে হয়। মন, বা ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত শরীরও, অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের যে-সকল মাধ্যম রয়েছে সেগুলোকে প্রতিবন্ধক বা শৃংখল বলে গণ্য করা উচিত; এগুলো এক একটা উপাধি, মানুষ এই উপাধির ফাঁদে পড়তে প্রলুব্ধ হয়। মুশকিলটা এইখানেই: অবিদ্যার কারণ বা ফলশ্রুতি কি এই সব উপাধি? এই সব প্রতারক জ্ঞানেন্দ্রিয়? আমাদের বিবেচনায় এগুলো স্পষ্টতই

অবিদ্যার কারণ ; কিন্তু সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মতো এগুলিও কি সেই অনাদি ও সার্বিক অবিদ্যার ফসল নয়, যা না-হলে এমন কি ব্রহ্মের পক্ষেও বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃজনক্ষমতায় সক্রিয় থাকা অসম্ভব হতো ? এই বিষয়টাকে বিস্তৃতভাবে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখবার প্রয়োজন আছে। শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে (পৃঃ ৭৮৭, ৭৮৯) * এই বিষয়টাকে ছুঁয়ে গেছেন মাত্র, এর মীমাংসা করেন নি : 'শরীর ধারণ করলে অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে যাবতীয় বিষয় ও তার ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের মধ্যে আত্মার সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমান অবস্থা আবৃত হয়।' এই প্রসঙ্গে একটা উপমাও আমরা পেলাম : কাঠের মধ্যে বা ভস্মের আবরণে আগুন যেমন তার আলোকশক্তি ও দাহিকাশক্তি নিয়ে গুপ্ত থাকে, শরীর ও ইন্দ্রিয়সর্বস্ব উপাধির সঙ্গে আত্মার মিলনের ফলে তেমনি আত্মা আবৃত হয়। অর্থাৎ নাম-রূপ থেকে অবিদ্যাপ্রসূত উপাধির সঙ্গে মিলনের ফলে আত্মার এই ভ্রান্তি জন্মে যে, সে বুঝি ঐ সব উপাধির সঙ্গে অভিন্ন, আত্মার সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমানতা আবৃত হওয়ার এই হলো কারণ। অবিদ্যার বশবর্তী হ'য়েই ব্রহ্ম নাম-রূপ গ্রহণ ক'রে থাকেন—এই 'নাম-রূপ' চরাচরের সমস্ত বিষয়ের মূল আদর্শরূপে অর্থান্বিত গ্রীক ভাষার 'লোগোই' শব্দের কাছাকাছি। সে যাই হোক, এর পরেই আসছে প্রাণ-অপ্রাণ নির্বিশেষে বস্তুগত উপাদানের আলোচনা, অর্থাৎ সমগ্র বিষয়মুখী বাস্তব জগত। কিন্তু এ-সবই ভ্রমাত্মক, মায়া। প্রকৃতপক্ষে, স্বতন্ত্র পদার্থ বলে কিছু নেই, স্বতন্ত্র জীব বলে কিছু নেই, তবু যে এ-সবের অস্তিত্ব আছে বলে বোধ হচ্ছে সেটা থাকবে, যতদিন অজ্ঞানতা থাকবে আত্মা বা ব্রহ্মাকে আচ্ছন্ন ক'রে।

* Deussen, 'সিস্টেম্ অ্ব বেদান্ত,' পৃঃ ১১৫

একম্ অদ্বিতীয়ম্

প্রত্যেক বস্তু বা প্রত্যেক ব্যক্তি-সত্তায় সত্য তবে কী? এই প্রশ্নের উত্তর হলো : ব্রহ্ম, যিনি দ্বিতীয় রহিত, সেই পরম এক আছেন সর্বভূতে। কিন্তু এই উত্তরের সারবত্তা শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন যারা অবিদ্যাকে জেনে অবিদ্যাকে ধ্বংস করেছেন। এ ছাড়া, অন্যদের জীব-জগৎ সম্পর্কে প্রত্যয় এ-ও-তা, যখন যেমন মনে হয়। বস্তুত মানুষের নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা অহংসর্বস্ব, দেহগত এই অহং বা 'আমি'-বোধ নিয়ে সে দেখছে, শুনছে, জানছে, বিচার করছে, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজকর্ম করছে, কিন্তু একজন কট্টর বৈদান্তিকের কাছে তাঁর আসল পরিচয়—তাঁর প্রত্যায়িত আত্মা—লুকিয়ে আছে অহং-এর গভীরে যে-অহং মায়াময় প্রপঞ্চের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জাগতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও দূরবর্তী সাক্ষীরূপে অবস্থান করবার পরিবর্তে অহং-সর্বস্ব মানুষ নিজেই কারক, নিজেই ভোক্তা। সে তখন 'সংসারে' প্রবেশ করে সংসারের নিয়মে চালিত হয়, যাবতীয় কর্মের দাস হয়ে একের পর এক জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে তাকে তখন অগ্রসর হ'তে হয় যতদিনে না সে পরিণামে আবিষ্কার করে প্রত্যয়িত ব্রহ্মকে—যে-ব্রহ্মই একমাত্র সত্যরূপে বিদ্যমান, তার নিজের মধ্যে 'আত্মা'রূপে এবং একই সময়ে 'পরমাত্মা' বা ব্রহ্মরূপে বিরাজমান—এই আত্মা, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই স্বরূপের অন্তর্গত। এই জ্ঞানার্জনের জন্য মনের যে-সংগত অবস্থার প্রয়োজন সৎ কর্ম তার সহায়ক, কিন্তু একমাত্র জ্ঞানেই মানুষের ত্রাণ, মানুষের মুক্তি, সৎ কর্মে নয়। এই মুক্তিলাভ বা মোক্ষের ভাষা ব্যক্ত হয়েছে 'তৎত্বমসি' শব্দের মধ্যে। তৎত্বমসি অর্থাৎ তুমিই তাই—মানে, তুমি তো তুমি নও, তিনি, সেই একমাত্র সত্তা ব্রহ্ম;—আত্মা বা 'সেল্ফ' ও ব্রহ্ম একই স্বরূপ।

শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে। তবু, ঈশ্বর-যে তমসাচ্ছন্ন নৈরাজ্য থেকে এই জগত সৃজন করেছিলেন সেই চলিত ধারণার অর্থ, নির্ভুলরূপে বলতে গেলে, এই ধারণা ছাড়া আর কিছুই না যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নৈরাজ্যের ঠাঁই নেই কখনও, এবং ঈশ্বর আপন শক্তিবলে এই জগতের উপযুক্ত নিমিত্ত ও উপাদান সরবরাহ করেছিলেন। রামানুজের দাবি ও যুক্তিপ্রমাণ শঙ্করের মতো অমন একগুঁয়ে নয়। চরাচরে সত্য বলতে শুধু ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু না, শঙ্করের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি একমত। কিন্তু ব্রহ্ম যে নানা ধর্ম বা গুণে অন্বিত তাঁর এই মতবাদ শঙ্কর প্রবলরূপে অস্বীকার করেন। রামানুজের মতানুসারে সগুণ ব্রহ্মের প্রধান গুণ মনন বা বুদ্ধি, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, প্রেমময়, তিনি নানা সৎগুণের অধিকারী। তাঁর মধ্যে কোনো কোনো বিশেষ শক্তি নিহিত এবং বহু হবার বীজ উপ্ত রয়েছে, এই হেতু আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ পার্থিব বিষয়ের বাস্তব রূপান্তর ও খণ্ড জীবের জন্মান্তরকে নিতান্তই প্রপঞ্চ বা মায়ার প্রতিভাসিক না বলে প্রকৃত ব্রহ্মেরই প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। ব্রহ্মের এই রূপান্তরিত চরিত্রকে বলা হয় 'ঈশ্বর' এবং চিৎ ও অচিৎ এই দুই জগত মিলে তাঁর শরীর জগত তাঁকে 'অন্তর্যামী' বলা হয় এই কারণে যে, বিষয় ও মন নামে যে দুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বাস্তবতা আছে তিনি উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ কর্তা—এই কথাটা শঙ্কর মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার করেন। আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণার সঙ্গে যদিও রামানুজ একমত নন, কিন্তু তিনি অভিব্যক্তিবাদের শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রলয়কালে সমস্ত কিছুই পরম ব্রহ্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ও অব্যক্তরূপে নিহিত ছিল, তাই আবার ক্রমশ বিশ্বচরাচরে বস্তু ও বিষয়রূপে স্বতন্ত্র চেহারা নিয়ে প্রকট হ'লো। পূর্বপুরুষের এর চেয়ে ভালো চেহারা কি আমাদের অভিব্যক্তিবাদীরা ভাবতে পেরেছেন? তাঁদের ভাষা ও শব্দ ভিন্ন হ'লেও সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বিষয়ে তাঁরা যা বলেছেন তা ঐ একই ব্যাপার। রামানুজ কার্য ও কারণ এই দুই পৃথকভাবে ব্রহ্মস্বরূপকে বিচার করেছেন, আবার কার্য-কারণ যে

একই স্বরূপের অন্তর্গত সে কথাও বলেছেন, যদিও আমরা যাকে কারণ বলি তা আমাদের বিবেচনায় 'পরিণাম' বা ক্রমবিকাশের কার্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত আমরা অজ্ঞানের বশবর্তী হ'য়ে কেবলই বিবর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন, শঙ্করের এই অভিমতের পরিবর্তে রামানুজ বললেন যে ব্রহ্মের বাস্তবিকই পরিবর্তন আছে, বললেন যে ব্রহ্মের মধ্যে যাকে প্রথমে মনে হয় প্রচ্ছন্ন তা'ই শেষ পর্যন্ত বিষয় মুখে বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়। শঙ্কর রামানুজের মতানৈক্যের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'লো এই যে, শঙ্করের শেষ লক্ষ্য যখন ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মকে পুনরায় লাভ করা, রামানুজ তখন সৎ কর্মের যোগ্যতা ও গুণাগুণ স্বীকার ক'রে নিয়ে বলছেন, সৎ কর্মের ক্রমপর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিমার্জিত হ'তে হ'তে পরিশুদ্ধ চিত্ত ব্রহ্মভূমিতে উত্তীর্ণ হয় এবং পুনর্জন্মে নিঃশঙ্ক হ'য়ে পূর্ণানন্দ লাভ করে। আমরা তাঁর ধারণার সঙ্গে একমত যে আত্মা ব্রহ্মের সামীপ্যে এসে ব্রহ্মময় হতে পারে, একটি বাদে ব্রহ্মের সমস্ত শক্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেই একটি শক্তি হ'লো প্রপঞ্চময় জগত সৃষ্টি করা, শাসন কিংবা পালন করা এবং সময় এলে সমগ্র সৃষ্ট জগতকে আপনার মধ্যে গ্রাস করা। এইরূপে রামানুজ কেবল প্রাতিস্বিক আত্মায় নয়, ঈশ্বরে অর্থাৎ ব্যক্তি সম্বন্ধীয় ভগবানেও, প্রত্যেক ব্যক্তিতার (Individuality) অধিকার নির্দেশ করেছেন। অপরপক্ষে, ব্যক্তির আত্মা ও ব্যক্তি ঈশ্বর উভয়কেই শঙ্কর অবাস্তব বলে বাতিল করে দিয়ে একাত্মবোধের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে উভয়ের সত্যকে স্বীকার করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, মুমুক্ষু ব্যক্তির পরম সত্য ও চরম লক্ষ্য বলে রামানুজ যা ব্যাখ্যা করেছেন শঙ্কর তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন নি। এ মতবাদ তাঁর কাছে সহনীয় হ'লেও এই জ্ঞানকে তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্নমার্গের জ্ঞান বলে মনে করতেন এবং ব্যক্তিব্রহ্মকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর ব্রহ্ম বলে। এই ব্রহ্মকে 'অপরাং' (অর্থাৎ নিম্ন পর্যায়ভুক্ত অপ্রধান) বা অপরা ব্রহ্ম এবং 'সগুণ' বা সগুণ ব্রহ্ম বলে অভিহিত করা হয়। এই অপরা ও সগুণ ব্রহ্ম রামানুজ ও তাঁর অসংখ্য অনুগামীদের কাছে নিছক ব্যক্তি-ঈশ্বররূপে

পূজিত হন, এমন কি 'বিষ্ণু' বা 'নারায়ণ' নামে ব্যক্তি ঈশ্বরের জনপ্রিয় নামকরণও হ'য়েছে। বাইরের অবয়ব বা 'প্রতীক'-এর মধ্যেই কেবল এই ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণা করতে হয়, শঙ্করের এই অভিমতের সঙ্গে আমরাও বলতে পারি, দেবতার প্রতিমূর্তি ও তাঁর উপাসনা অজ্ঞতার নিদর্শন হ'লেও সহনীয়, কার্যত হিতকর বলেও সুপারিশযোগ্য। ঈশ্বর বিষয়ে ইহুদি ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের যে ধারণা তা, শঙ্করের দৃষ্টিতে, ঐ দেবতার প্রতিরূপ বা প্রতীকেরই অনুরূপ। ঈশ্বরকে যে-ভাবে উপাসনা করা হয় ঈশ্বর যেন তাই, এবং তাই হ'য়ে আছেন, এই ধারণায় সাধু ও ধার্মিক ব্যক্তিদের অন্তহীন সুখ। কিন্তু অন্তহীন মোক্ষলাভ কেবল সত্য জ্ঞান অর্জনের দ্বারাই সম্ভব, অর্থাৎ সেই পুনরার্জিত ব্রহ্মত্বে, যার ফলে জীবনমুক্তি শুধু নয়, যাবতীয় কর্ম থেকে অব্যাহতি, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম রোধ, এককথায় হেতুবাদের যাবতীয় অনুশাসন থেকে সর্বাত্মক মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। ভাবতে অবাক লাগে, বেদান্তের এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্ম অথবা দর্শনের কতকগুলো মৌল ও আবশ্যিক প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বিমত হ'য়েও কেমন ক'রে সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করেছিলেন। বড়োজোর অজ্ঞানতা অথবা সহজ ভাষায় যাকে বলে, অনিবার্য অবিদ্যা, এ ছাড়া শঙ্কর-ভক্তরা রামানুজ-ভক্তদের বিরুদ্ধে মিথ্যা-দর্শনের দোষারোপ করেন না। এমন কি যদিও প্রপঞ্চময় জগত ও প্রাতিস্বিক মানস অবিদ্যারই ফলশ্রুতি তথাপি, আমরা দেখেছি, এগুলোকে অন্তঃসারশূন্য বা মিথ্যা বলে জ্ঞান করা হয় না;—বরং বলা হয় যে, অবিদ্যার মায়ায় আচ্ছন্ন হ'লেও ব্রহ্মতে এ-সবের বাস্তবতা বিদ্যমান, কেবল অবিদ্যামুক্ত নির্মল দৃষ্টি লাভ করলেই আমরা এই সত্য দেখতে পারি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগত একেবারে মিথ্যে তা তো নয়, এ হ'লো নিত্যকালের পরম সত্যের প্রকাশ—তাকে ব্রহ্ম, আত্মা, নিত্য, ইন্দ্রিয়াতীত যা-ই বলো না কেন, কিংবা কান্টের ভাষায় Das Ding an Sich। তাছাড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জগত যে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে সত্য বলে গণ্য হ'য়ে থাকে এ-কথা

কট্টর অদ্বৈতবাদীরাও অস্বীকার করেন না। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মেতে এর ভিত্তিমূল না-থাকলে এর 'বিদেরি' বা বিদ্যমানতার কথা মনেই হতো না। একমাত্র রহস্য যা তা হলো অবিদ্যা বা অজ্ঞান, যাকে প্রায়শ মায়া আখ্যা দেওয়া হয়। এটা বাস্তব অথবা বাস্তব নয়, এমন কথা শঙ্কর নিজে কখনো বলেন না। তিনি যা বলতে পারেন তা হলো এই যে, হ্যাঁ, অবিদ্যা তো আছেই, বেদান্ত-দর্শনের লক্ষ্য এই অবিদ্যাকে বিদ্যা দ্বারা ধ্বংস করা, অজ্ঞানতাকে জ্ঞান দ্বারা—মনে হয়, এইভাবে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, অবিদ্যা সত্য নয়।

প্রথম দৃষ্টিপাতে বেদান্ত-দর্শনকে বিস্ময়কর মনে হবে, নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার পরে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'তে হ'তে এ-দর্শন এতই চিত্তাকর্ষক হ'য়ে ওঠে যে অবাক লাগে, অন্য যে-কোনো দেশের দার্শনিকদের কাছে এই দর্শন কেন অনুদ্‌ঘাটিত হ'য়ে থাকবে। মনে হয় সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করেছে এই দর্শন, শুধু একটা বাদে। সেই সমস্যাটি এই যে, বেদান্ত-দর্শন অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে আপনাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, এমন কি সেই সব ধর্মের সঙ্গেও নয় যে-সব ধর্ম ঐশী প্রকাশ ও অলৌকিক ঘটনার দুর্গপ্রাচীরের অন্তরালে আপনাকে সুরক্ষিত করেনি। যে বিশেষ মানসিক অবস্থায় আমরা ধর্ম ও দর্শনের সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি সেই মানসতা নিয়ে সহজভাবে এই বেদান্ত-দর্শনের দ্বারস্থ হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নয়। পূর্বে আমি এর একটি দরজা এই প্রশ্নাঘাতে উন্মুক্ত করবার প্রয়াস পেয়েছিলাম যে, যা-কিছু দেখছি তার কারণ কী?—উত্তর পেলাম: সেই কারণ একটি এবং অদ্বিতীয়, কেননা যা অসীম ও নিত্য দ্বিতীয়ের উপস্থিতিতে তা সীমাবদ্ধ ও অনিত্য হয়ে পড়ে। আমরা দেখেছি, আমাদের চারিদিকে নিয়ত বিবর্তনশীল ও অনস্বীকার্য যে-জগত বর্তমান তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের সংবেদনের তর্কাতীত বৈচিত্র্য-ব্যাখ্যার জন্য কী ভাবে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার অবতারণা করতে হলো। মজার ব্যাপার এই যে পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় বিষয়ের মনন-চিন্তন ও নামকরণের মূল আদর্শরূপে গ্রীক

দার্শনিকরা যাকে 'লোগোই' বলেছিলেন, দিব্য প্রজ্ঞা বা কুতর্কের ভাষায় ব্যবহার না-ক'রে অজ্ঞান বা অবিদ্যার ফলশ্রুতি 'নাম-রূপ' হিসেবে বেদান্ত তাকে কাজে লাগালেন। এই গ্রীক ধারণা, আপাতদৃষ্টিতে যা বেদান্ত-ধারণার বিপরীত, আসলে একই, কেবল দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ। নাম-রূপ এবং 'লোগোই' (নাম এবং কৃতনাম) একই ভাবের দ্যোতক : যেহেতু উপলব্ধ চিন্তা বা ধারণা বাক অর্থাৎ বচনে প্রকাশ পায় সেই হেতু সমস্ত সৃষ্ট জগৎটাই একটা বাক, তার মানে অন্তহীন মননের ভাষাবন্ধ— তা সে ব্রহ্ম কি দেবতা যে-বিষয়েই হোক না। কথাটা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এই বিশ্বজগৎ একটি আইডিয়ার ভাষা যে আইডিয়া যুক্তি-বুদ্ধির নিপুণ ঔৎকর্ষের মধ্য দিয়ে সাধারণ সত্তা থেকে মননের চরমতম প্রকাশের মধ্যে অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম আদিতে ছিলেন বাক্ এই সহজসিদ্ধ তত্ত্বটি বেদান্ত-দর্শন, নব-প্লেটো-দর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শনের মধ্যে সমাপতনকে এখনো চমকপ্রদরূপে প্রকাশ করে, যদিও যুক্তিবাদী বিশ্বের এইসব প্রাচীন ধারণার মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্রের ভাবনায় বিপদের আশংকা আছে। পাছে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও গ্রীক ভাবনার অন্তর্গত 'লোগোস' বা শব্দব্রহ্মের নিকট-আত্মীয় যে-বাক্ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎস, সেই বাক্-এর হিন্দুধারণাকে আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছি সেইজন্য আমি এই প্রসঙ্গে শঙ্করভাষ্যের (পৃঃ ৯৬, ১) একটি অংশের আক্ষরিক অনুবাদ দিচ্ছি। শঙ্করের অভিমত অনুযায়ী ব্রহ্ম হ'লেন শুদ্ধবুদ্ধি এবং যখন বিরুদ্ধ পক্ষ মন্তব্য করেন যে, বুদ্ধির বিষয়মুখ না থাকলে বুদ্ধির প্রকাশ অসম্ভব তখন তিনি তার উত্তরে বলেন : 'আলোকিত করবার মতো বিষয় না থাকলেও যেমন সূর্য আলোক বিকিরণ করে, বুদ্ধি প্রয়োগের বিষয় না থাকলেও তেমনি ব্রহ্মের বুদ্ধি বা জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। সৃষ্টির পূর্ব থেকেই এইসব বিষয় 'নাম-রূপে', এখনো অপরিণত অবস্থায়, বিদ্যমান, অথচ পরিণত অবস্থার জন্য নিয়ত সচেষ্ট। 'অব্যাকৃতে', 'ব্যাচিকীর্ষিতে' শব্দগুলো দ্বারা এ-সব কথা বলা হ'য়েছে এবং বেদের এই কথাগুলো সৃষ্টির বহু পূর্বে স্রষ্টার মনে প্রাণবন্তরূপে বিদ্যমান ছিল।'* প্লেটো নিজে কি এ-সব কথা লিখতে পারতেন না ?

* Deussen কৃত Das System des Vedanta গ্রন্থের পৃঃ ৭৫, ১৪৭ দ্রষ্টব্য।

আত্মানং বিদ্ধি

এবারে বেদান্ত-দর্শনের আরেকটি দরজা দিয়ে প্রবেশলাভের চেষ্টা করবো আমরা। এর ফলে বেদান্তকে আমরা আরো কাছাকাছি পাবো, কিংবা বেদান্ত পাবে আমাদের, তখন এর রীতি-পদ্ধতিকে আর অদ্ভুত মজাদার ব্যাপার বলে মনে হবে না, তখন এর প্রাণস্পর্শ পাবো আমরা এবং কিছু কিছু কমিয়ে বাড়িয়ে একে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে লাগাতে পারবো। *

প্রাচীন গ্রীক-দর্শনের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বিষয় : 'আপনাকে জানো', আত্মানং বিদ্ধি। এ-ক্ষেত্রে হিন্দু দার্শনিকেরা অমনি এগিয়ে এসে বলবে যে তাদের নিজেদের দর্শনশাস্ত্রেরও এটা মহত্তম বিষয়, আরও গভীর ভাবে বলে : 'আত্মানং আত্মনা পশ্য'—মানে, আপনার অন্তরে আপনাকে দিয়ে দেখ। কিন্তু খাঁটি দার্শনিকের মতো তাঁরা কোনো কথাকে যাচিয়ে না-দেখে ছেড়ে দেয় না। সুতরাং তাদের জিজ্ঞাস্য : 'আপনাকে দিয়ে' কথাটার মানে কী? বা কাকে বলা হচ্ছে? বেদান্ত দর্শনকে বলা হয় নেতিবাদের দর্শন, অর্থাৎ যা অসত্য তাকে বারংবার অস্বীকার ক'রে সত্যে পৌঁছবার প্রয়াস। না, না, এটা নয়, ওটা নয়—এই হলো এর চরিত্র। সুতরাং বেদান্ত প্রথম যে কথা বলবে সেটা এই যে, আমরা যাকে 'আমি' বলি—self বলি—সেটা শরীর হতে পারে না। সত্যের খাতিরে শরীরকে 'সৎ'—অর্থাৎ অস্তিত্ববাচক—বলা যায় না, শরীরের সে অধিকার নেই, কেননা আজ হোক কাল হোক এর ধ্বংস অনিবার্য, এবং যা সত্যি-সত্যি থাকে, যা অস্তিত্ববাচক সৎ, তার ধ্বংস নেই। শরীর যেহেতু চিরন্তন নয়, বাস্তবতার মহত্তম অর্থেও এ বাস্তব নয়। সুতরাং কোনটা সত্য-সত্যই

* তুলনীয় : Deussen, ঐ, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৬০ ও তৎপরবর্তী

বাস্তব সে-কথা আমরা জানতে গেলে দেখবো, দেহ বা স্থূল শরীর কখনো self বা 'আমি' হতে পারে না।

কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, যা-কিছু আমরা জানি সব-কিছুই জানি চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মারফৎ এবং এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বাইরে আমরা যেতে পারি না; যখনি দেখি যে, জীব-জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিরূপের অধিক কিছুই আমাদের নেই বা কখনো থাকতেও পারে না; আর যখন দেখি যে, আমরা যাকে জ্ঞান বলি তা-ও প্রথম দৃষ্টিপাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিরূপ না-হয়ে যায় না, তার অন্তরালবর্তী সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য যে প্রকল্প-পদ্ধতির (hypothesis) প্রয়োজন তাকে উপেক্ষা ক'রে প্রাথমিক অবস্থায় ঐ ইন্দ্রিয়াগত প্রতিরূপকেই আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিই—তখন, হ্যাঁ, তখন কি আমরা বলতে পারি না যে আমাদের 'আমি' আর কিছুই না, কেবল ইন্দ্রিয়-সমষ্টিরই একটা সামগ্রিক পরিচয়? বৈদান্তিক আবার বলবেন: না না, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ বাস্তবিক ভারি আশ্চর্য্য, কিন্তু এরা শুধু আমাদের জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ মাধ্যম, আমাদের শরীরের অংশমাত্র, স্থূল শরীরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং এরা আমাদের 'সত্য আমি' হতে পারে না। তাছাড়া, এই পঞ্চেন্দ্রিয়, হিন্দুরা যাকে বলেন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, সেই সঙ্গে তারা আরো পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বলে স্বীকার করে, এই সব কর্মেন্দ্রিয় হ'লো। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। হিন্দুদের এই এক অদ্ভুত ধারনা যে, প্রথম পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাইরে থেকে ধীরে ধীরে ভিতরে 'উপলব্ধি'র ক্ষেত্রে কাজ করে, আর শেষোক্ত পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের 'কর্ম' ভিতর থেকে বাইরে। আমাদের সকল জ্ঞানের নির্ভর যে-সব প্রতিরূপ (Images) ইন্দ্রিয় মারফৎ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, সেগুলোকে আমরা বলি আমাদের চেতনার বিভিন্ন অবস্থা, তারা 'অহং'ও নয়, আমাদের 'আমি' থেকেও বহু দূরে। তারা আসে আর যায়, তাদের এই দেখা গেল, এই আর গেল না, সুতরাং তাদের বাস্তব বা চিরন্তন

কিছুই বলা যায় না, তারা দেহের মতই সামান্য। এই সব প্রতিরূপে আমরা সক্রিয় বিষয়ীর সঙ্গে নিষ্ক্রিয় বিষয়ের পার্থক্য বুঝতে পারি। আমরা যাকে বস্তু বলতে অভ্যস্ত এই নিষ্ক্রিয় বিষয় হলো তা-ই, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বস্তু পাঁচ ভাগে বিভক্ত যেমন, গন্ধের উপযোগী 'ক্ষিতি', স্বাদের 'অপ', দর্শনের 'তেজ', স্পর্শের 'মরুৎ', শ্রবণের 'ব্যোম'। বস্তুর এই পাঁচ ভাগ অর্থাৎ পঞ্চভূতকে আমরা আইনত পাঁচটি উপাদান বলতে পারি। আমাদের কাছে এরা কেবল চেতনার এক-একটা অবস্থা, বা 'বিজ্ঞান'। পরন্তু আমরা এ-কথা জানি যে, মৌল পদার্থ আছে এবং জ্ঞাতরূপে অথবা জ্ঞানের কোনো এক অবস্থার মধ্যে তা থাকতে পারে ; তার বাস্তবসত্তা সম্পর্কে বেদান্ত যা-ই বলুক না, তার অস্তিত্বকে বেদান্ত অস্বীকার করে না। আমাদের ইন্দ্রিয়াগত জ্ঞানের বিষয় (object) যদি হয় অবিদ্যাপ্রসূত, তবে তার উপাদানের ভাগ্যেও সেই অবিদ্যারই অংশ, সুতরাং সে জ্ঞান মায়া প্রপঞ্চের বাস্তবতার বেশি দাবি করতে পারে না।

যেহেতু প্রত্যেকটি মৌল উপাদান বা ভূতের উপযোগী কয়েকটি অবিমিশ্র অনুভূতি আছে—যদি থাকে—সেই হেতু প্রত্যেক উপাদানের পাঁচটি ক'রে গুণ ধরা হয়, প্রত্যেকটি গুণের একটি প্রধান, বাকিগুলো অপ্রধান। এই তথাকথিত পাঁচগুণ বা 'পঞ্চিকারণ' প্রাচীন বেদান্তে পাওয়া যায় না ; পরবর্তী যুগে বেদান্তের পরিশোধিত রূপ (যদিও সর্বক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বলা যায় না) জনপ্রিয় 'বেদান্তসারে' উক্ত পঞ্চগুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই উপাদান বা ভূতের স্বতন্ত্র, এবং মনে হয় সবচেয়ে মৌল ধারণার সাক্ষাৎ মেলে উপনিষদগুলোতে—যেমন 'ছান্দোগ্য উপনিষদে (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। ভারতবর্ষে আমরা সাধারণত চারটে ভূত বা উপাদানের সাক্ষাৎ পাই কিংবা, শব্দের বাহন হিসেবে 'ব্যোম' (আকাশ) ধরলে, পাঁচটির। পার্থিব জগতের অতিপ্রয়োজনীয় উপাদানের সবচেয়ে প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী উপাদান মূলত ছিল তিনটি—যেমন, মৃণ্ময়, অগ্নিময় ও জলময়। এই তিনটি

উপাদান সম্ভবত অগ্রাহ্য করা চলে না এবং প্রকৃতপক্ষে উপাদানের এই তিন শ্রেণীর পরিচয় ছান্দোগ্যে, দেওয়া হয়েছে এই ভাবে : অন্ন, তেজ এবং অপ্—কিংবা সেখানে যেমন ভাবে সাজানো হ'য়েছে : প্রথমে অগ্নি-আলোক উত্তাপের 'তেজ', তারপর জলের 'অপ্' শেষে ভূমির দ্যোতক 'অন্ন'। এ-কথা সত্য যে 'অন্ন'র অন্য মানে খাদ্য, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অন্নকে খাদ্য-উৎপাদনকারী ভূমি হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রথম উপাদান 'তেজ'-এর রং লাল, দ্বিতীয় 'অপ,-এর রং শ্বেত, তৃতীয় 'অন্ন'—অন্নর রং কালো। এই তিন উপাদান সমান অনুপাতে তিন ভাগে মিশ্রিত হ'য়েছে বলে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। এবং মানবদেহের মৌল উপাদান হিসেবে এরা তিনভাবে মানবদেহ গঠন ক'রে বিরাজমান : অন্নের অংশ দিয়েছে মাংস, মল আর মানস, অপ্ বা জলীয় অংশ দিয়েছে মূত্র, রক্ত আর প্রাণ, তেজ বা অগ্নিময় অংশ দিয়েছে অস্থি, মজ্জা আর বাক। এ-সবের অনেক শৌখিন দূর কল্পনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় উপনিষদে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, এইসব প্রাচীন চিন্তা ও মনীষার ভাণ্ডারে সরল, মৌল ও যুক্তিপূর্ণ যে-সব বিষয়ের স্বাক্ষর আছে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে আমরা অনাবিল রাখবো না। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় : এইসব সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলো কি 'আমি' হতে পারে? অমনি বৈদান্তিক মহাশয় বলে উঠবেন : নেতি, নেতি, এরা আমাদের অন্বিষ্ট নয়, এরা সেই সত্য শাশ্বত অপরিবর্তনীয় 'অটোস' বা আমি হতে পারে না।

এ-কথা যদি দশটা ইন্দ্রিয়ের পক্ষে প্রযুক্ত হয় তাহলে, মাঝে-মাঝে যাকে একাদশ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে অভিহিত করা হয়, সেই মানস বা মনের ক্ষেত্রেও সমান জোরে তা প্রযোজ্য—সবই অন্নভূমি প্রসূত, পার্থিব। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে মানস বা মন কথা ল্যাটিন 'mens' শব্দের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ইংরেজিতে সুতরাং তার তর্জমা হয়েছে 'mind' বলে। কিন্তু যদিও সাধারণ ভাষায় মনের ব্যবহার এই অর্থেই প্রচলিত, সংস্কৃত ভাষার দর্শনশাস্ত্রে এ অর্থ সংকীর্ণ। এই মন হ'লো ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি

ও কার্যের সম্মিলিত রূপের মধ্যমণি। আমরা যাকে বলি অভিনিবেশ বৃত্তি অর্থাৎ 'অবধান' মনের মৌল কার্য তা-ই: বিভিন্ন ইন্দ্রিয় একসঙ্গে হুড়োহুড়ি ক'রে বিচিত্র ছাপ মেরে গোলমাল বাঁধিয়ে না তোলে তার জন্য দ্বাররক্ষকের কাজ করে মন। সহজেই দেখানো যায় যে, ইন্দ্রিয়ের এই মধ্যমণিটিও বৈদান্তিকের নেতির খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। এটা 'আমি' হ'তে পারে না, যে-আমি নিত্য ও সত্য; মন কেবল একটা মাধ্যম বা করণ মাত্র, এবং সেইজন্যই একে বলা হয় 'অন্তঃকরণ' অর্থাৎ অন্তরতর অঙ্গ। যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও সেই একই প্রমাদ। আমাদের 'অন্তঃকরণ' বা মনের বিচিত্র প্রকাশের জন্য আমাদের মনোভাবকে অর্থাৎ মনকে—ব্যক্ত করতে এত অজস্র কথা ব্যবহার করা হয়েছে যে এ বিষয়ে আমরা উপকৃত না-হ'য়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে যাই। সবচেয়ে খারাপ এই, যে সব শব্দ মনোভাবকে প্রকাশ করেছে পরবর্তীকালে সেই শব্দ-গুলোকেই মনের অদ্ভুত সামর্থরূপে গণ্য করা হয়েছিল। যদি তা গণ্য করা না হ'তো অমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংজ্ঞা নিয়ে মনের বিশেষ-বিশেষ অর্থ এগিয়ে আসতো এবং কালক্রমে তা-ই বর্তে যেত। ইতিমধ্যে এইরূপ অসংখ্য কৃত্রিম প্রাচীর সম্পূর্ণ অমান্য ক'রে মানুষের ভাষাস্রোত উজান ঠেলে এগিয়ে গেল, এবং প্রত্যেক নবদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট শব্দের অসুবিধা দিন দিন বড়ো হয়ে উঠলো। এটা খুব সহজেই বোঝা যায়, প্রত্যেক ভাষা আমাদের অনুভূতি ও বিচারশক্তির বিচিত্র অভিব্যক্তির উপযোগী সুসংহত ও যথার্থ শব্দের যোগান দিতে যদি সমর্থ না হয়, তাহলে আমরা যখন অন্য ভাষা থেকে আহরণ ক'রে সেই ভাষায় মনোবিদ্যা সংক্রান্ত কোনো বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতে উদ্যত হই, তখন গোলমালটা আরো বেশি জটিল আকার ধারণ করে। যেমন, 'আত্মার' তর্জমা করতে গিয়ে যদি 'Soul' বলি—প্রায়ই যা করা হয়েছে—তাহ'লে ঐ শব্দ দ্বারা নির্লিপ্তিকে প্রায় রিপুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে যদি আমরা মনের তর্জমা করি জ্ঞান—Verstand অর্থে তাহলে আমাদের তর্জমা এমন এক

সুশৃংখল অনুভূতি বৃত্তিকে নির্দেশ করবে যা সবচেয়ে নিচু থেকে সবচেয়ে উঁচু তলার যে-কোনো রকম বিচারক্ষমতায় সক্ষম। আমাদের মতে Verstand শব্দটায় মানুষের সঙ্গে জন্তুর পার্থক্য নির্দেশ করে, অপর পক্ষে জীবজন্তু এমন কি গাছপালার মধ্যে মন নেই এমন কথা বেদান্ত বলেনা। *

সুতরাং মনে হয়, সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের প্রায়োগিক (টেকনিকল) শব্দগুলো যথাসম্ভব স্বাধিকারে রাখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, এবং Soul না বলে 'আত্মা'কে আত্মা, 'দ্য সেল্‌ফ্'কে সেল্‌ফ্ ('আমি') আর জ্ঞান বা Verstand না-বলে 'Manas'কে (মন) তা-ই কিংবা হয়তো 'mind' বলাই ভালো।

এমন কি সংস্কৃত ভাষায়ও আমরা এই টেকনিকল শব্দ নিয়ে গোলমাল আরো ভয়াবহরূপে দেখতে পাবো, সেখানে বিস্তর শব্দ প্রায় সমার্থক তা থেকে বিশিষ্ট শব্দটি বিশ্লিষ্ট করা যায় না। 'ইন্দ্রিয়' শব্দের পাশাপাশি তাই দেখা যায় 'প্রাণ' (আক্ষরিক অর্থে জীবনীশক্তি) শব্দ, যেখানে 'মনস' শব্দটি অপরিহার্য শর্ত হিসাবে না থেকে ইন্দ্রিয়েরই এক অবস্থা তথাকথিত 'মুখ্য প্রাণ' রূপে যুক্ত হয়ে আছে--মুখ্য প্রাণ মানে প্রাণবায়ু যা ফুসফুস থেকে উত্থিত হ'য়ে মুখ দিয়ে নির্গত হয় এবং যা, নির্বোধের নিয়মে না বলতে চাও তো, কৃত্রিম উপায়ে পাঁচটি প্রকারে বিভক্ত। ইন্দ্রিয়ের মতো 'মনস্' শব্দটিও তারপর দেহের একটি অঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হলো,—আমার বিশ্বাস, অনুভূতি যন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক মধ্যমণির চেয়ে তার মানেটা আর বেশি দূর গড়ালো না। কিন্তু মনের কাজ অনেক, এবং সেই সব কাজের এক একটি নামের সঙ্গে মনের এক একটি নামের পরস্পর বিনিময় ঘটে। আমাদের 'বুদ্ধি' আছে—বুদ্ধি হলো অনুভূতি ও মানসক্রিয়ার সাধারণ নাম, তারপর 'চিত্ত' যার মানে চিন্তা বা চিন্তক, 'বিজ্ঞান', যার মানে বিচার বা একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ নিরূপণ—এই সমস্ত অর্থের কোনো-কোনোটি এক একটি ভিন্ন

* Deussen-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃঃ ২৫৮ দ্রষ্টব্য

বৃত্তি বা গুণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। শঙ্কর তবু তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতাবলে সমস্ত অর্থকেই এক মনস্ শব্দের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে কখনো তার মানে করেছেন যুক্তিবিচার, কখনো বোধ, মন অথবা চিন্তা। এতে তাঁর মনোবিদ্যা বহুল পরিমাণে সরল করেছে, আবার ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি করেছে। নানা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবদান যে প্রতিরূপ (Images) তা-ও মনসের অন্তর্ভুক্ত ; এটা এই, ওটা ঐ, এ-রকম 'নিশ্চয়'বোধ এবং 'অধ্যবসায়' ও মনসের (মনের) এলাকাধীন। প্রতিরূপ 'ধারণা' (Concepts) ও 'সংকল্পে'র জন্ম দেয় ; এদের যথাক্রমে বলা হয় 'সমস্যা' ও 'বিকল্প', এদেরই ফলশ্রুতির নাম বিচার। এগুলোর মধ্যে আমরা মনোবিদ্যার উপাদান হিসেবে এমন সব অপরিশোধিত জিনিসের সাক্ষাৎ পাই যা, স্বীকার করতেই হবে, বেদান্ত দার্শনিকেরা কখনো নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেননি। শঙ্করের সংজ্ঞার্থক চেয়েও মূলগতভাবে এরা এত বেশি অর্থান্বিত যে মনোবিদ্যার বিভিন্ন প্রায়োগিক শব্দের অনুকূল। শঙ্করের মতানুসারে মনস্ (মন) আমাদের কাছে সবই : মনের ছাপ বা ধারণা (Impressions), প্রতিরূপ, প্রত্যয় (Concepts), প্রভেদ-বিচার এমন কি আত্মসচেতনতা বা অহংকার পর্যন্ত সবই, ফলত বিষয় এবং বিষয়ীর প্রভেদ নির্ণয়ও মনস্-এর এক্তিয়ারে। কিন্তু যখন আমরা এই প্রশ্ন করি যে, মনস্ বলতে অহংকার বা বুদ্ধি বা চিত্ত—কাম, ধী (ভয়), হ্রী (লজ্জা) ধী (প্রজ্ঞা), বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শ্রদ্ধা (বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা (অবিশ্বাস), ধৃতি (সিদ্ধান্ত), অধৃতি (অধৈর্য)—মনের আরোপিত এই সব গুণের বা লক্ষণের একটিকেও কি বলা যাবে 'সত্য' আমি ? —আমাদের এই প্রশ্নের বৈদান্তিক উত্তর : না, নেতি ; ওরা অনিত্য, ওরা সংবৃত, ওরা আসে আর যায়, থাকে না, ওরা আমাদের অন্বিষ্ট হতে পারে না, 'সত্য ও শাশ্বত আমি' হতে পারে না। এটা স্পষ্ট যে, আমরা যখন বলি, 'আমার দেহ' তখন দুটো জিনিসকে পূর্বস্বীকৃত বলে মনে হয়— একটা হলো 'দেহ', দ্বিতীয়টি দেহের মালিক। তেমনি আমরা যখন

বলি, আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন, এমন কি আমার অহং, তখনো আমরা মালিক ও মালিকানার বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করি। কিন্তু 'আমার আমি' এ-কথা কখনো বলি না কেননা এতে পুনরুক্তির দোষ আছে; 'আমি'টা তো আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নির্দেশ করে না। নেহাৎ যদি 'আমার আমি' বলতেই হয় তো বুঝতে হবে আমাদের 'অহং'কে, আর 'আমি'টা আমাদের পর্যায়ে ফেললে বুঝতে হবে আমাদের সকলের মধ্যেকার 'আমি'-কে, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম'কে—যে-ব্রহ্ম আমাদের সকলের মধ্যে, জগতের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে আবৃত হয়ে আছেন। মৃত্যু হ'লে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় বলে মনে করা হয় না, নব জীবনের প্রাক্কালে স্থূল বহিরঙ্গের ধ্বংস হলেও ওরা মৌল ও প্রচ্ছন্নরূপে সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান ক'রে সজীব থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীর জন্ম থেকে জন্মান্তরে গতায়াত ক'রে পুনরায় স্থূল শরীর ধারণ করে। কিন্তু একবার প্রকৃত মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হ'লে এই বায়বীয় সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হ'য়ে সেখানে অবস্থান করেন শুধু আত্মা বা ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি শাশ্বত। সূক্ষ্ম শরীর জন্মান্তরে কোন অবয়ব গ্রহণ করবে সেটা গত জন্মের কর্ম ও চিন্তা অনুযায়ী নির্দিষ্ট: এটাও বলতে গেলে হেতুবাদের নিয়মে বাঁধা।

তাহ'লে 'অটোস্' বা আত্মার ব্যাপারটা কী?—এ-বিষয়ে গ্রীক ঋষিরা কিছু বলেন না, তাঁদের কাছে 'অটোস্' অহংকার থেকে বেশি-কিছু না, কিন্তু বৈদান্তিকদের কাছে আত্মা সুস্পষ্টরূপে নাহং-এর বিপরীত অহংকার নয়, বরং তার থেকে বহু দূরে, হেতুবাদের নিয়মের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আত্মা এমন একটা কিছু যে ক্লেশহান, নিরাসক্ত ও নিষ্ক্রিয়, অথচ যাকে না-হলে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনো শরীরই টিঁকতে পারে না। এই যে 'আমি', এই যে প্রকৃত 'অটোস্' বা আত্মা, প্রকৃত আত্ম-চৈতন্যের হৃদ্‌কমলে তাঁর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল নৈর্ব্যক্তিক নিরাকার অবস্থায়, যদিও তিনি জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন, তিনি অনাদি ও অনন্তকাল ধরে অস্পৃষ্ট এবং নিতান্ত সাক্ষীস্বরূপে বিরাজমান। আমি পূর্বে বলেছি, বেদান্ত-দর্শন নেতিবাদের দর্শন; এর বচন কেবল নেতি নেতি, 'আমি'

সম্পর্কে এর বক্তব্য না-বাচক, 'আমি'-র প্রতিষ্ঠায় এ-দর্শন সকল বাক্য ও চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে। বেদ যেমন বলেন, ব্রহ্ম বা 'আমি' থেকে আমাদের সকল চিন্তা সকল বাক্য পথভ্রষ্ট হয়ে ফিরে আসে। আমাদের 'আমি'-র ধারণার সমীপবর্তী করতে পারে এমন কিছু-কিছু উদ্যম উপনিষদের কোনো-কোনো অংশে আছে বটে—এই 'আমি'কে ব্রহ্ম বা আত্মা যে-নামই দেওয়া যাক না কেন—কিন্তু উপনিষদের উদ্যম এই তুইয়ের বা পরম শক্তিমান এক-এর সংজ্ঞা নিরূপণের তুস্তর পথে কখনো ধাবিত হয়নি। ছান্দোগ্যো উপনিষদে আমরা ব্রহ্মের বর্ণনা দেখি এইভাবে: "এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। কারণ তাঁর থেকেই জগৎ জাত হয়, তাঁর মধ্যে জীবিত থাকে এবং লীন হয়। অতএব শান্ত হ'য়ে তাঁকে (ব্রহ্মকে) উপাসনা করবে। মনই যাঁর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ, লিঙ্গশরীর (অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীররূপ প্রাণ) যাঁর দেহ, চৈতন্যদীপ্তিই যাঁর রূপ, তিনি সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ক'রে বর্তমান, ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহবিবর্জিত। এই আত্মাই হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত, সর্ষপ বা তার অন্তর্বীজ থেকেও সূক্ষ্মতর; হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত এই আত্মাই পৃথিবী থেকে বিশালতর, অন্তরীক্ষ থেকে বৃহত্তর, দ্যুলোক থেকে বৃহত্তর,—এই সমস্ত লোক থেকে বিশালতর। যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ক'রে বিদ্যমান, তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহবিবর্জিত; ইনিই হৃদয়-পদ্ম মধ্যে অবস্থিত আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম, দেহত্যাগের পর আমি তাঁকেই পাব। তাঁকে পেলে এ-বিষয়ে আর-কোনো সংশয় নেই।" *

ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনা বারংবার হয়েছে। ছান্দ্যোগ্যে যেমন তার নমুনা প্রভূত পরিমাণে দেখতে পাই তেমনি দেখতে পাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২য় অধ্যায়, ১—৭ খণ্ড)। একটার পর একটা তত্ত্ব, তারপর সব তত্ত্ব শেষ হ'য়ে গিয়ে নিরাকার ব্রহ্ম। প্রথমে গেল রক্ত-মাংসের স্থূল দেহ, তারপর প্রাণবায়ু, তারপর মনের সঙ্গে গেল চিন্তা,

* ছান্দ্যোগ্যো: ৩য় অধ্যায়, ১৪ খণ্ড; ঋষি শাণ্ডিল্যের উক্তি।

একে একে সমস্ত অদৃশ্য হ'য়ে গিয়ে বাকি রইলেন পূর্ণানন্দ ব্রহ্ম। ইনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারাৎসার। ইনিই সেই ব্রহ্ম যিনি দৃষ্টির অগোচর, বস্তুর অতীত, অপ্রকাশ্য, অপরিমেয়, যিনি বিশ্রাম, শান্তি ও আনন্দের আকর। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যাই বলুন না, যতক্ষণ কোনো একটা মহত্তম বিষয় পরিত্যাক্ত ও গুপ্ত হ'য়ে আছে, যতক্ষণ তিনি তা লাভ না করেন, ততক্ষণ তাঁর বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই। অথবা যাজ্ঞবল্ক্য যেমন বলেন : 'যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, তাঁর সব জানা হ'য়ে গেছে।' যিনি বাস্তবিক অপ্রকাশ্য তাঁকে প্রকাশ করবার জন্য যতগুলো নাম কল্পনা করা যায় উপনিষদে তার সবই ব্রহ্মেতে প্রযুক্ত হয়েছে। 'ব্রহ্ম কী? তিনি হ্রস্বও নন, দীর্ঘও নন, স্থূল বা সূক্ষ্ম কিছুই নন; তাঁর কোনো ভূমিকা নেই, তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি অচঞ্চল, নিষ্কলঙ্ক, ছলনারহিত; তাঁর জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, তিনি অভী; অন্তরে-বাহিরে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান।' এইরূপ সত্তাকে পুরুষ বলা যাবে কিনা সন্দেহ, তিনি স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন; সর্বনামের নির্বিশেষ ও মহত্তম অর্থে এই সত্তাকে বলা যেতে পারে 'ইনি'।

এইরূপে আমরা যে-দুটো বিচার-পদ্ধতির পরিচয় পেলাম তার প্রথমটির সূত্রপাত এই স্বতঃসিদ্ধকে অবলম্বন ক'রে যে 'সত্যকার আমি' বা ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, আর দ্বিতীয়টির অভিমত হ'লো : ব্রহ্ম অবিকারী, শাশ্বত ও আদিঅন্তহীন—এবং আমরা দেখলাম যে, এই দুই বিচার-পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেমন : জগৎ-কারণ ব্রহ্মস্বরূপ এই পরিবর্তনশীল পার্থিব জগতের উপলব্ধ বিষয় হ'তে পারেন না, এবং আমাদের সোহং ব্রহ্মকেও আমাদের গোচরীভূত এমন-কিছুই বলা যায় না যা নিয়ত জন্মাচ্ছে, জীবনধারণ করছে, লয় পাচ্ছে এবং যা নিত্য পরিবর্তনশীল, তার কোনো-কিছুতে তিনি নেই। উভয় বিচার-পদ্ধতিকেই এক কথায় বলা যায় 'নেতি'; যদিও উভয়ের মধ্যে একটা বাস্তব সত্তা আছে যার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অন্য সব কিছুই 'নেই'। যদি জগৎ সত্য হয়, ব্রহ্ম তবে সত্য নয়, ব্রহ্ম সত্য হলে জগৎ মিথ্যা।

উপসংহার : তৎত্বমসি

তারপর উপসংহারে এই কথা আসে যে এই দুই 'আমি' বা দ্বৈত সত্তা (জগৎ-স্বরূপ ও সোহং) মূলত এক এবং অদ্বৈত, যদিও বিভিন্ন পথে এই সত্যের উপলব্ধি। মানুষ মায়া-প্রপঞ্চের মানুষ, জগৎ প্রপঞ্চময়, পার্থিব দেবতারাও তা-ই; কিন্তু পূর্ণ সত্তায় এরা সকলেই ঈশ্বর—তাঁকে আত্মা বা ব্রহ্ম যা-ই বলো না কেন—শুধু অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার মায়ায় ক্ষণকালের জন্য সমাচ্ছন্ন ও ভিন্নরূপ, অথচ বিদ্যা বা বেদান্ত-দর্শনের সাহায্যে চিরকাল স্বরূপে উপলব্ধির যোগ্য।

এই সব ধ্যান-ধারণা, মনে হয়, হিন্দু মানসে অতি প্রাচীন কাল থেকে অল্পবিস্তর জনপ্রিয়রূপে পরিব্যাপ্ত। স্কুলে-চতুষ্পাটিতে এই সব ধ্যান-ধারণার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু সেখানে ছাড়াও এ-সব বোধহয় সেখানকার মাতৃদুগ্ধেই মিশ্রিত হয়ে আছে। ইওরোপীয় মানসে বিতৃষ্ণা আনবার জন্য এ-গুলোকে প্রায়ই অতিরঞ্জিত ও হাস্যকররূপে দেখানো হয় বটে কিন্তু সরলতা ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে এই সব ধ্যান-ধারণার মধ্যে এমন একটা সত্য নিহিত আছে যা ধর্ম ও দর্শনের কোনো ছাত্রই নির্বিঘ্নে উপেক্ষা করতে পারে না। 'অদ্ভুত' আখ্যা দিয়ে একে আর সরিয়ে রাখবার উপায় নেই—মিস্টিক বলেও নয়, যতক্ষণ না মিস্টিকের যথার্থ সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রে যুক্তির দ্বারা এ-কথা প্রমাণ করা যাচ্ছে যে, যা-কিছু মিস্টিক নামে অভিহিত ধর্মে বা দর্শনে তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। এ-কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে, এই ধ্যান-ধারণার পথ ধরে চলতে গিয়ে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ধর্ম ও প্রত্যেক দর্শনের শেষ পরিণতি তো তা-ই। ভ্রান্ত যুক্তির বিষয়ে আমি পূর্বেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি : সৎকর্ম যেহেতু মুক্তি অর্জন

করতে পারে না, মন্দ কর্মও, সুতরাং, মুক্তি বিষয়ে নিরপেক্ষ ও অপ্রতিবন্ধক। বেদান্তের মতানুসারে সৎকর্ম অবশ্যই সোজাসুজি মোক্ষের পথে নিয়ে যায় না, তবে মোক্ষের পথে সৎকর্ম প্রথম আবশ্যিক পদক্ষেপ রূপে অভিজ্ঞাত; এবং জ্ঞান ও পরমসুখ লাভের পথে মন্দ কর্ম মানুষের পরিপন্থী। কোনো সন্ত যে পাপ কাজ করতে পারেন না, 'জ্ঞানীরা অপাপবিদ্ধ' এটা কেবল ভারতবর্ষেই সত্যরূপে স্বীকৃত নয়, এ-কথা ঘরে-বাইরে সর্বত্র স্বীকৃত—পাপ সম্পর্কে ধারণা যেখানে যেমনই থাক না কেন। এই কথাটা যথেষ্ট গভীরভাবে রামকৃষ্ণের বর্তমান শিষ্যদের মনে ধরানো যায় না যে, তাঁদের তরফ থেকে সম্ভাব্য সামান্যতম নৈতিক শৈথিল্য, কিংবা জ্ঞানীরা সমস্ত নৈতিকতার উর্ধ্বে এই যুক্তিতে নৈতিক শৈথিল্যের সাফাই, গুরুগম্ভীর লোকদের চোখে শিষ্যদের স্বকর্মের মর্যাদা ও গুরুর সম্মান এমনভাবে ভূলুণ্ঠিত করতে পারে যা আর-কিছুতেই না। রিপুদমনের সম্পূর্ণতার ফলে এই-এই লোকের পক্ষে পাপ করা সম্ভব নয়, সে-কথা বলা এক; কিন্তু জ্ঞানার্জনের কোনো ত্রুটির ফলে নির্লিপ্ত ও স্থিরচিত্ত অবস্থা থেকে যদি কারো বিচ্যুতি ঘটে তবে সে-বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা যায় না, এটা আবার আরেক কথা হ'য়ে গেল। স্বীকার করি, প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞরাও এ-বিষয়ে কম নিঃসংশয় ছিলেন না, কিন্তু চিরায়ত বৈদান্তিক রচনায় এ-প্রসঙ্গে প্রত্যয়ের সঙ্গে কিছু উল্লেখিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বৈদান্তিক মুক্তিসাধনার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে কঠোর নৈতিকতা সম্পর্কে অসংখ্য পঙক্তি আছে যা থেকে কিছু-কিছু অনিশ্চিত পঙক্তি দুর্নীতির সপক্ষে যে-কেউ ব্যবহার করতে পারেন। বেদান্তের সব কথা জানবার পর বেদান্তের বিষয়ে সমালোচনার, অথবা সম্ভব হলে এর উৎকর্ষ সাধনের, উদ্যম-আয়োজনে কিছু সময় লাগে। আমরা যখন প্লেটো, আরিস্তোতল, স্পিনোজা কি কাণ্টের বিচার-পদ্ধতি অধ্যয়ন করি তখন তা করি নির্ভুল, স্বয়ংসম্পূর্ণ, নগদ-নগদ সত্য হিসেবে নয়, সত্যের পথে সহায়করূপে আমরা তা অধ্যয়ন করে থাকি। এ-সবের মধ্যে সত্যের যে-বিভিন্ন অংশের প্রকাশ তা খুব সহজেই ভয়াবহ

বিস্ফোরণের পথে নিয়ে যেতে পারে। পূর্বের তুলনায় বর্তমান যুগে আমাদের কাছে যা অধিকতর প্রয়োজন তা হ'লো ভারতসহ সমস্ত দেশের দর্শন শাস্ত্রের ঐতিহাসিক অনুশীলন—এ-সব দর্শনের জন্মরহস্য কী, কী ভাবেই বা যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়ে তা ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠলো। আমরা যদি তা করি তবে প্রত্যেক দর্শনের বিজয়-বৈজয়ন্তীর নবীন হাওয়ায় আমরা ভেসে যাবো না এবং বারংবার আলোচিত হবার পরেও উক্ত দর্শনের সাম্প্রতিককালের ওকালতির দৌড়টাও আমরা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারবো। তখন আরো অনেক বিষয় অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, যেমন—অভিব্যক্তিবাদের আইডিয়াকে দার্শনিক অভিনবত্ব মনে করে আমাদের কালের দর্শনপ্রবণ সাধারণ লোকেরা চমকে উঠছে, এমন কি গত হাজার দুই বছর ধ'রে বারংবার আলোচিত হয়েছে যে-তত্ত্ব তার প্রথম ও সত্যিকারের আবিষ্কর্তা কে তাই নিয়ে উচ্চকিত বাগবিতণ্ডা চলেছে—এ-সব বিষয় প্রায় অবিশ্বাস্য বলে কানে লাগবে। যাকে পরিণাম বলা হয়, অর্থাৎ যা প্রচলিত অভিব্যক্তি না-হ'লেও রামানুজের সমর্থনপুষ্ট অভিব্যক্তি, শঙ্কর তাকে অগ্রাহ্য করেছেন। পৃথিবীর অভিব্যক্তি প্রনালীর যে-বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমরা এ-যাবৎ পেয়েছি তা যে রামানুজ থেকে হার্ডার অবধি সকলের প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি উচ্চাঙ্গের এ-কথা আজ কে অস্বীকার করবে? কিন্তু দর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস যিনি জানেন তাঁর কাছে দার্শনিক আইডিয়া ও তার ব্যাখ্যা এক জিনিস নয়। ডারউইনের মতো ব্যক্তি, যিনি প্রগতি বিজ্ঞানের একজন প্রখ্যাত পর্যবেক্ষক ছিলেন, একজন দার্শনিক—একজন বিমূর্ত দার্শনিকরূপে তাঁর পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত অশোভন। ঠিক এই বিষয়েই তাঁর নিজেরই প্রবল আপত্তি ছিল।

বর্তমান রচনায় অবশ্য সরল ও বিশুদ্ধ ভারতীয় দর্শন নয়, ভারতীয় লোকমানসের সাম্প্রতিক কালের প্রতিভূ রামকৃষ্ণের উপর উক্ত দর্শনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আমি আগ্রহী। তিনি নিজে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন

ভক্ত-সাধক ও ঈশ্বর-প্রেমিক, জ্ঞানী থেকে যা অনেক বেশি।* যে-পটভূমি থেকে রামকৃষ্ণ বেরিয়ে এসেছেন, নড়াচড়া করছেন, আলোয় ছায়ায় ঘেরা সেই দার্শনিক পটভূমিটি লোকচক্ষে উপস্থিত করতে আমি বেদান্ত দর্শনের এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটির সংযোজন প্রয়োজন মনে করেছিলাম। কোনো অর্থেই রামকৃষ্ণ মৌলিক চিন্তা বা নূতন আইডিয়ার উদ্ভাবক ছিলেন না, পৃথিবীর কোনো নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পথিকৃৎও তিনি নন। কিন্তু তিনি অনেক জিনিস উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর পূর্বে অনেকেই যা করেন নি। 'দিব্য সত্তা' অথবা 'দিব্য আবির্ভাবকে' তিনি এমনভাবে স্বীকৃতি দিলেন যে তিনি যে একজন কবি, একজন খাঁটি সত্যাগ্রহী কিংবা, বলতে পারো, দিব্য স্বপ্নদর্শী ছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্ন বা দিব্যদর্শনেরও সত্যমূল্য আছে, তা আমাদের সহৃদয় মনোযোগের যোগ্য। কোনো সারগর্ভ দার্শনিক রচনা রামকৃষ্ণ কখনো লেখেন নি ; তা শুধু তিনি তাঁর ছোটো-ছোটো বাণীতে ঢেলে দিয়েছেন ; লোকেরা তাঁর সেই বাণী শুনতেই আসতো—হয়তো তখন তিনি ভাবাবিষ্ট বা সমাধিস্থ থাকতেন, হয়তো কথা বলার ক্ষমতাই তখন তাঁর থাকতো না। যে-সকল তথ্য আমরা জানতে পাই তা থেকে এ কথাটা খুবই স্পষ্ট যে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে প্রভূত ক্ষমতা ও সুদীর্ঘকাল যোগাভ্যাসের ফলে তিনি স্নায়বিক উত্তেজনক্ষম এমন এক তুঙ্গ অবস্থায় এসে উপনীত হ'য়েছিলেন যে, যে-কোনো মুহূর্তে তিনি মূর্ছিত বা অজ্ঞান হ'য়ে যেতে পারতেন—এটাই তথাকথিত সমাধি। সম্পূর্ণ শরীরগত

* কিশোরীলাল সরকার প্রণীত 'The Hindu system of Religions science and Art, or the Revelations of Rationalism & Emotionalism, Calcutta, 1898' নামক চমৎকার গ্রন্থে ভক্তি ও জ্ঞানের এই পার্থক্য বিষয়ে বিশদ বিবরণ আছে। "জ্ঞান দেখে দূরবীক্ষনী দৃষ্টিতে"—লেখক বলছেন—"আর ভক্তি অনুবীক্ষনী দৃষ্টিতে। জ্ঞান হ'লো সারাৎসারের জ্ঞান, আর ভক্তি মধুরতার উপলব্ধি। পরম বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আবিষ্কার জ্ঞানের এক্তিয়ার, আর ভক্তির সঙ্গে পরম প্রেমিকের লীলা বিনিময়।"

অথবা মনোগত, এই দু-দিক থেকেই সমাধির বিচার করা চলে। সাধারণ সমাধি মূর্ছার মতো, তা থেকে যে-কোনো লোক মামুলী অবস্থায় আবার ফিরে আসতে পারে, কিন্তু সত্যিকার সমাধির অর্থ ব্যক্তি-সত্তা লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে পরমসত্তায় বিলীন হওয়া। এই সমাধি থেকে আর ফিরে আসা নেই; কেননা ফিরে আসবার মতো সত্তার কোনো অবশিষ্টই থাকে না। এই ভাব সমাধি থেকে খুব কম ব্যক্তিই ফিরতে পারেন; সমাধি অবস্থার প্রাক্কালে খানিকটা অহং রেখে দেন তাঁরা এবং মানবত্রাতা ও মানবের শিক্ষাদাতা হবার ফলপ্রদ অভিলাষেরও খানিকটা। তা অবলম্বন করেই তাঁরা ফিরে আসতে সমর্থ হ'ন। একেবারে সমাধিরই অনুরূপ নিঃস্বপ্ন গভীর নিদ্রার একটা অবস্থা আছে, সে-অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য আত্মা ব্রহ্মসংলগ্ন থাকে বলে মনে করা হয়, ব্রহ্মসংলগ্ন থাকবার পরেও তা ফিরে আসতে পারে। এই গভীর যোগনিদ্রার চারটি অবস্থা : জাগরণ, স্বপ্নময় অর্থাৎ দিব্য দর্শনময় নিদ্রা, নিঃস্বপ্ন অর্থাৎ দর্শনহীন নিদ্রা ও লুপ্তপ্রায় অবস্থা। রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এ-রকম প্রায়ই দেখা যেত যে তিনি এই যোগনিদ্রায় মগ্ন হ'য়ে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন যে তার ভক্ত-শিষ্যদের ভয় হতো : তিনি বুঝি আর সজ্ঞানে ফিরে আসতে পারলেন না; এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর দেহত্যাগের সময়েও এই আশংকাই ছিল। ঐ সময়ে তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফিরলেন না। মৃত্যু শুধু তাঁর রক্ত-মাংসের দেহ ও প্রাণবায়ুর নাগাল পেল, কিন্তু তাঁর আত্মা তাঁর সীমিত 'আমিকে' অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মত্বে গিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। সমস্ত মায়া-প্রপঞ্চ থেকে, প্রাতিস্বিকতা থেকে মুক্ত হ'য়ে নির্মেঘ নিরাকারের সকল মহিমায় তাঁর 'আমি' পরমাত্মা বা বৃহত্তম অহং-এ গিয়ে বিলীন হয়ে গেল। অর্থাৎ তিনি তাঁর শাশ্বত সত্তায় চিরকালের মতো চলে গেলেন।

রামকৃষ্ণের বাণী

তাঁর বাণী অথবা কথামৃত সঞ্চয়ন ক'রে ভক্ত-শিষ্যরা বাংলাভাষায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, কিছু-কিছু সংস্কৃতভাষায় কিছু বা ইংরাজিতে তর্জমা করা হয়েছে। এ-সকল বাণীর মধ্যে এমন অনেক আছে যা আমাদের সংস্কৃতভাষায় ছন্দোবদ্ধ নানাবিধ বাণী-সংগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রামকৃষ্ণ-বাণী তা থেকে স্বতন্ত্র, কেননা এগুলো গদ্য, নিশ্চিতরূপে তাৎ-ক্ষনিক চিন্তার ঝোঁকে উচ্চারিত এবং এখানে-ওখানে ইওরোপীয় ভাব-ধারায় অনুরঞ্জিত। ইওরোপীয় ভাবধারা ইংরেজি-অনভিজ্ঞ রামকৃষ্ণ পেলেন কি করে? নিশ্চয়ই কেতাব পড়ে নয়, তিনি তা পেয়েছিলেন ইঙ্গ-ভারতীয়দের সংস্পর্শে এসে। আমি এই বাণীর একটি সম্পূর্ণ সঞ্চয়ন রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দর কাছ থেকে পেয়েছি। বিবেকানন্দ তাঁর মিশনারী কর্মের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় সুপরিচিত। আমার কাছে সে-বাণী যেমন এসেছিল তেমনি প্রকাশ করছি, কেবল অপরিহার্য প্রয়োজনবোধে কিছু-কিছু সংশোধনও করেছি। প্রথমে বিভিন্ন নামকরণের নিচে এগুলোকে বিন্যস্ত করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম, ও-রকম করলে বাণীগুলো বৈশিষ্ট্য হারিয়ে একঘেয়ে হ'য়ে উঠতে পারে। এই বাণীগুলোয় আমার বিশ্বাস আছে, তারা রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির সত্যিকার পরিচয় বহন করে। তাৎক্ষণিক চিন্তার চকিত আলোর ইশারা হ'লেও এই বাণী-গুলোকে কোনক্রমেই সুবিন্যস্ত বলা যায় না, পুনরুক্তি ও স্ববিরোধী মনোভাব থেকেও মুক্ত নয় তারা। এই বাণীর কোনো-কোনটি আমি বর্জন করতে চেয়েছিলাম এই কারনে যে, আমাদের মানসিকতায় ও-গুলো

যে কেবল বিস্বাদ তা-ই নয়, উপরন্তু রুচিহীন ও অপবিত্র বলেও মনে হয়। কিন্তু বর্জন করলে আমার পক্ষে কি ইতিহাসের সত্যকেই ক্ষুণ্ণ করা হ'তো না? দেশে-বিদেশে এত ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছেন যিনি, এবং এখনো করছেন, আমরা সেই ব্যক্তি সত্তাটিকে জানতে চাই, ঠিক সেই-সেই মানুষটিকে, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কল্পিত মানুষটিকে নয়। তাঁর প্রকৃত পরিচয়কে বাদ দিয়ে ভিন্ন ভাবে তাঁকে কেউ দেখুক এটা তিনি নিজেই পছন্দ করতেন না, বরং নিজেকে প্রায়ই তিনি খাটো করে অকিঞ্চিৎকররূপে দেখতে চাইতেন। তাছাড়া, আমি যদি বাণীগুলোর কোনো-কোনটি ইচ্ছেমতো ছেটে দিতাম, আমি জানি কিছু লোক আছেন যারা এ-কথা ভাবতে লজ্জিত হতেন না যে, প্রাচ্যের প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মগুলো প্রকৃতপক্ষে যা, তার চেয়ে কেতাদুরস্তভাবে অভিব্যক্ত করার বাসনা থেকেই আমি তা করেছি। অথচ এই ধরনের লোকেরাই রামকৃষ্ণ-বাণী থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় জিনিস পাবেন।··· না, আমি মনে মনে বললাম, না, ঐ থাক, গমের সঙ্গে আগাছা যেমন আছে তেমনি থাক। এই বাণীগুলো পড়তে-পড়তে হঠাৎ একটু ভাবনার দোলা লাগবে না, কোনো অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে সত্যের ইশারা চমকে উঠবে না ভাবুক পাঠকদের মধ্যে এমন খুব কমই আছেন। অপরপক্ষে যেমন-তেমন এখান-ওখান থেকে বাণী কুড়িয়ে নিয়ে সে-গুলো কেমন নিষ্প্রাণ, কেমন নির্বোধ তা দেখানোর মতো সহজ কর্ম আর-কিছুই নেই। এ-সব কায়দা পুরনো, ভারতবর্ষে এ-কায়দা চাল-ব্যবসায়ীর কায়দা বলে সুবিদিত : ধান-ক্ষেত বিক্রি করবার সময়ে বা কেনবার সময়ে চাল-ব্যবসায়ীরা সুবিধে মতো এক মুঠো ভালো বা খারাপ ধান তুলে নিয়ে ক্ষেতটা দামি কি যাচ্ছেতাই সেটা তোমাকে বুঝিয়ে ছাড়বে। এই বাণীগুলো ভালো, মন্দ, নির্লিপ্ত যা-ই হোক না, আমার কাছে তা চিত্তাকর্ষক মনে হয়। কেননা এতে একদিকে যেমন আছে ভাবনার এক বিশেষ উদ্ভাস, তেমনি অন্যদিকে আছে বেদান্তের কোনো-কোনো ভক্তিমূলক ও কার্যকর বিষয়কে প্রাধান্য দেবার প্রয়াস—উপরন্তু অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে বেদান্তের সংগতির

কথাও এই বাণীগুলোর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। বেদান্তেরও যে একটা নিজস্ব নৈতিকতা আছে এই বাণীগুলো পাঠ করলে তা স্পষ্ট হবে; বেদান্তের নীতিবাদ সাধারণ্যের পক্ষে অতীব উচ্চস্তরের ও অতিরিক্ত অধ্যাত্মবাদীয় হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের পক্ষে তা কল্যাণপ্রদ—চিরকাল তা-ই ছিল, শত শত শতাব্দী ধ'রে তা-ই থাকবে।

সর্বশেষে, আমার বন্ধু মজুমদার, রামকৃষ্ণের অগণিত ভক্তশিষ্য, বিশেষত বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবাদীর সম্পাদক—এঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ; তাঁদের লোকান্তরিত গুরুর কথামৃত-সংগ্রহ প্রকাশে তাঁরা আমাকে সর্ববিষয়ে সহায়তা করতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নি।

রামকৃষ্ণ কথামৃত
বা
রামকৃষ্ণদেবের বাণী

১। রাতের আকাশে কত তারা তোমরা দেখতে পাও, কিন্তু সূর্য উঠলে তা আর দেখা যায় না। তাই বলে কি বলবে দিনের আকাশে একটিও তারা নেই? তেমনি অজ্ঞান অবস্থায় ঈশ্বরকে দেখতে পাওনা বলে কি বলবে ঈশ্বর নেই?

২। একই জল, নানা লোকে নানা নামে ডাকে। কেউ বলে জল, কেউ 'অ্যাকোয়া', কেউ বলে 'ওঅটর', কেউ বা 'পানি'। তেমনি সেই একই সচ্চিদানন্দ—কেউ বলছে 'গড', কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ বলছে 'হরি', কেউ বা 'ব্রহ্ম'।

৩। বহুরূপীর রঙ্ নিয়ে দুটি লোকের মধ্যে তুমুল তর্ক। একজন বললে, 'খেজুর গাছের ওপর বহুরূপীটার রঙ্ চমৎকার লাল।' অমনি আরেকজন বলে উঠল, 'না হে, ভুল করছো, বহুরূপীর রঙ্ লাল তো নয়, রঙটা আসলে নীল।' তর্কের মীমাংসা হ'লো না, তখন তারা গেল ঐ খেজুর গাছটার তলায় যে-ব্যক্তি থাকতেন তার কাছে, সে-ব্যক্তি নিশ্চয়ই বহুরূপীর সমস্ত রঙ্ দেখেছেন। দু'জনের একজন গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁ মশাই, গাছের ওপরের বহুরূপীর রঙ লাল তো?'—সে-ব্যক্তি বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তখন অপরজন বললে, 'কী যে বলেন আপনি, ওর রঙ তো লাল নয়, নীল।' গাছের তলার ব্যক্তিটি তখনও সবিনয়ে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তিনি জানতেন বহুরূপী এমন এক প্রাণী যে কেবল রঙ বদলায়, সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই তার জবাব হলো: 'হ্যাঁ'। সচ্চিদানন্দ হরিরও তেমনি বহু রূপ। ঈশ্বরকে যে-সাধক যে-রূপে দেখেছে তাঁকে সে শুধু সেই রূপেই জানে। কিন্তু যে তাঁর বহু রূপ দেখেছে সে-ই কেবল বলতে পারে এ-সকল রূপ সেই এক হরিরই বহু রূপ। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার এবং তাঁর আরো কত আকার আছে তা আমরা জানিনে।

৪। ঈশ্বরের অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যাঁর যে-নামে, যে-ভাবে তাঁকে ডাকতে ভালো লাগে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলে তাঁর ঈশ্বর লাভ হবে।

৫। চারজন অন্ধ হাতি দেখতে গেছে। একজন হাতির পায়ে হাত দিয়ে এসে বললে যে, হাতি থামের মতো; কেউ শুঁড়ে হাত দিয়ে এসে বললে যে,

হাতি মোটা লাঠির মতো ; কেউ পেটে হাত দিয়ে এসে বললে যে, হাতি জালার মতো ; কেউ কানে হাত দিয়ে এসে বললে যে, হাতি কুলোর মতো। এইভাবে হাতির চেহারা নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হ'য়ে গেল। পাশ দিয়ে একজন যাচ্ছিলেন, তিনি ওদের কলহের মধ্যে এসে বললেন : 'কী নিয়ে তোমাদের ঝগড়া ?' তখন তারা সব খুলে বললো এবং তাকে সালীশ মানলো। সব শুনে ঐ ব্যক্তি বললেন, তোমরা কেউ ঠিক হাতি দ্যাখো নি। হাতি থামের মতো নয়—হাতির পা থামের মতো। জালার মতো নয়—হাতির পেট জালার মতো। কুলোর মতো নয়—হাতির কান কুলোর মতো। মোটা লাঠির মতো নয়—হাতির শুঁড় লাঠির মতো। এই সব একত্র করলে যা হয়, তা-ই হাতি।' সেই রকম ঈশ্বরের এক দিক যারা দেখেছে তারা পরস্পর ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে কোঁদল করে।

৬। চিনি দিয়ে কত রকম পশু-পাখি তৈরি হয়—জগত্তারিনি মা-কেও তেমনি নানা দেশে নানা যুগে কত বিচিত্র নাম-রূপে পূজো করছে। ঈশ্বরের কাছে যেতে 'যত মত তত পথ'।

৭। একই সোনা দিয়ে কত বিচিত্র অলংকার তৈরি হয়—তার কত নাম, কত রূপ। তেমনি সেই একই ঈশ্বরকে দেশে-দেশে যুগে-যুগে বিচিত্র নাম আর রূপে পূজো করছে। কেউ তাঁকে ভালোবেসে ডাকছে 'পিতা', কেউ বলছে 'মা', এমনি আরো কত কী। তবু এই নানা সম্বন্ধের মধ্যে থেকেও ঈশ্বর সেই একই।

৮। প্রশ্ন : যদি সকল ধর্মের ভেতর এক ঈশ্বরের কথাই লেখা আছে তবে প্রত্যেক ধর্মে ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন দেখায় কেন ?

উত্তর : ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁর ভাব বিভিন্ন। যেমন গৃহকর্তা যিনি তিনি কারো বাবা, কারো ভাই এবং কারো বা স্বামী। ভাব ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ব্যক্তি এক। ঈশ্বর সেই রকম বিশেষ-বিশেষ সাধকের কাছে বিশেষ রূপে প্রতিভাত হয়ে নানা জনের কাছে নানাভাবে বিরাজ করছেন।

৯। যেমন কুমোরের দোকানে হাঁড়ি, গামলা, জালা, কলসী, থালা, পেলেট প্রভৃতি নানা মাপের নানা আকারের জিনিস থাকে, কিন্তু সবই ঐ কাদা-মাটির তৈরি। ঈশ্বরও তেমনি নানা দেশে নানা যুগে বিভিন্ন নাম ও রূপে উপাসিত হন।

১০। ঈশ্বর এক কিন্তু ভাবে বহু। মাছ এক কিন্তু ঝালে, ঝোলে, অম্বলে প্রভৃতি নানা রকমে যেমন তাকে আস্বাদ করা যায়, সেই রকম ভগবান এক হলেও সাধকেরা তাঁর নানা ভাবে রসাস্বাদন ক'রে থাকেন।

১১। মানুষ বালিশের খোল, উপরে দেখতে লাল, নীল, কালো—কিন্তু সবগুলোর মধ্যে সেই একই তুলো ; মানুষও তেমনি কেউ সুন্দর, কেউ কুচ্ছিত, কেউ সাধু, কেউ বা অসাধু—কিন্তু সকলের মধ্যে সেই একই ঈশ্বর।

১২। সমস্ত জলই নারায়ণ বটে, কিন্তু সমস্ত জল পান করা যায় না। সকল জায়গায় ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু সকল জায়গায় যাওয়া যায় না। কোনো জল দিয়ে আমরা পা ধুই, কোনো জল লাগে ঠাকুর সেবায়, কোনো জল আমরা পান করি, কিন্তু আবার এমন জলও আছে যা আমাদের স্পর্শেরও অযোগ্য। তেমনি সব জায়গা সমান নয়। কোনো জায়গার কাছে যাওয়া যায়, কোথাও গিয়ে আমরা একেবারে ভেতরে প্রবেশ করি, আবার কোনো জায়গার ছায়াও মাড়াইনে।

১৩। বাঘের ভিতর ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু তাই বলে আমরা নিশ্চয়ই ঐ হিংস্র জন্তুর সুমুখে যাবো না। ঈশ্বর তেমনি কু-লোকের মধ্যেও আছেন, কিন্তু কু-লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

১৪। যাঁকে দশজনে জানে, মানে ও গণে, তার ভিতরে ভগবানের বিভূতি অধিক পরিমাণে আছে বুঝতে হবে।

১৫। গুরু বললেন : 'সকল পদার্থই নারায়ণ।' শিষ্য এ-কথার প্রকৃত অর্থ না-বুঝে আক্ষরিক অর্থ বুঝে নিলে। তারপর রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সে এক হাতির সুমুখে পড়লো। হাতির উপর থেকে মাহুত চেঁচিয়ে উঠল : 'হুঁসিয়ার, সরে যাও।' শিষ্য মনে-মনে তর্ক করলে : 'কেন, সরে যাবো ? আমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কী ?' এই কথা ভেবে সে আর সরলো না। অবশেষে হাতি তাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ভীষণ চোট লাগলো তার। সে গুরুর কাছে ফিরে গিয়ে বললো সব কথা। গুরু বললেন : 'ভালো কথা। তুমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, কিন্তু মাহুতরূপী নারায়ণ যে তোমাকে হুঁসিয়ার করছিলেন তুমি তার কথা শুনলে না কেন ?'

১৬। ভক্ত, ভগবান ও ভাগবত এক।

১৭। সকল বস্তুই নারায়ণ। মানুষ নারায়ণ, পশু নারায়ণ, সাধু নারায়ণ, লম্পট নারায়ণ, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নারায়ণ।

১৮। অনেকে বরফের কথা শুনেছে, কিন্তু বরফ দেখেনি ; তেমনি ধর্মপ্রচারক অনেক আছেন, যাঁরা ঈশ্বরের তত্ত্ব শাস্ত্রে পড়েছেন মাত্র, জীবনে প্রত্যক্ষ করেন নি।

আবার যেমন অনেকে বরফ দেখেছে, চোখে দেখেনি—তেমনি প্রচারক অনেক আছেন যাঁরা তাঁর দূর আভাস মাত্র পেয়েছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কী, তাঁর মর্ম বুঝতে পারেন নি। বরফ যে চোখে দেখেছে সেই বরফের গুণ বলতে পারে। ঈশ্বরকে শান্ত, দাস্য ইত্যাদি ভাবে যিনি তাঁকে লাভ করেছেন, তিনিই তাঁর গুণ যথার্থ বলতে পারেন।

১৯। তেল না-হলে প্রদীপ জ্বলে না। ভগবান না-হ'লে মানুষ বাঁচতে পারে না।

২০। মানুষের দেহটা যেন হাঁড়ি আর মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো যেন জল, চাল ও আলু। হাঁড়ির ভেতর জল, চাল ও আলু দিয়ে তার নিচে আগুন জ্বেলে দিলে যেমন সেই জল, চাল ও আলুগুলো তেতে ওঠে এবং তাদের গায়ে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়, অথচ সে শক্তিটা তাদের নয়, আগুনের—সেই রকম মানুষের ভেতর ব্রহ্মশক্তি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানুষের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য করে এবং সেই শক্তির অভাব হলেই তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির কাজও অমনি থেমে যায়।

২১। সাপ হ'য়ে খাই আমি রোজা হ'য়ে ঝাড়ি।
হাকিম হ'য়ে হুকুম দিই, পেয়াদা হ'য়ে মারি॥

২২। ঈশ্বর চোরকে বলেন চুরি করতে, আবার গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে।

২৩। ঈশ্বর এ-দেহে কী ভাবে থাকেন? তিনি পিচকারির কাঠির মতো আল্‌গা থাকেন।

২৪। ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে হাতি গলাতে পারেন ঈশ্বর। তিনি যা-খুশি তা-ই করতে পারেন।

২৫। পুকুরের পানার ভেতরে মাছ যেমন কিল্‌বিল্ করে, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সেই রকম প্রত্যেক মানুষের ভেতর লীলা করছেন। (অর্থাৎ মায়ার অন্তরালে থাকেন বলে মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না।)

২৬। কল্পবৃক্ষের নিচে বসে একটি লোকের রাজা হবার ইচ্ছে হ'লো, অমনি দেখতে দেখতে সে রাজা হয়ে গেল। পরক্ষণে একটি পরম রূপবতী যুবতী মেয়ে পাবার কামনা জাগলো তার, নিমেষের মধ্যে তেমন এক অপরূপ মেয়েকে দেখা গেল তার পাশে। তারপর লোকটার কেমন মনে হতে লাগলো, যদি একটা বাঘ

এসে তাকে খেয়ে ফেলে! তা-ই হলো, একটা বাঘ কোথা থেকে এসে তাকে খেয়ে ফেললো। ভগবান সেই কল্পতরু: তাঁর কাছে এসে যে নিজেকে দীন-দরিদ্র মনে করে সে দীন-দরিদ্রই থাকে, কিন্তু সব অভাব-অনটন ভগবান পূরণ করেন মনে-মনে এই বিশ্বাস যার আছে সে ভগবানের কাছ থেকে সবই পায়।

২৭। জমিদারবাবু মস্ত ধনী, কিন্তু তবু যখন একজন গরিব চাষী বিনম্র চিত্তে তার হৃদয়ের অর্ঘ্য নিয়ে আসে, তিনি তা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন।

২৮। যখন ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজে, তখন একটা থেকে আরেকটা ধ্বনির তফাৎ বেশ বোঝা যায়। থেমে গেলে যে-ধ্বনিটা থাকলো তাকে আর আলাদা ক'রে চেনা গেল না। ঘণ্টার ধ্বনি ও স্বর যেন এক-একটা স্পষ্ট আকার নিয়ে আসে, থেমে গেলে একাকার—নিরাকার। ঈশ্বর তেমনি সাকার এবং নিরাকার।

২৯। প্রথম অবস্থায় লেখবার সময়ে ছোটো ছেলে বড়ো-বড়ো গোটা-গোটা আঁখরে লেখা রপ্ত করে। সাকারের মধ্যে মনকে নিবদ্ধ রেখে প্রথম-প্রথম আমাদের মনের একাগ্রতা শিখতেই হয়; একবার শিখতে পারলে তখন নিরাকার মনকে ছেড়ে দেওয়া সহজ হয়।

৩০। যেমন লক্ষ্যভেদ শিখতে হলে আগে মোটা জিনিসের উপর টিপ করতে হয়, তারপর সূক্ষ্ম জিনিসেও টিপ করা যায়; সেই রকম সাকার মূর্তিতে মন স্থির হলে নিরাকার মূর্তিতে মন সহজে স্থির করা যায়।

৩১। ঈশ্বর নিত্য ও অনন্ত ব্রহ্ম, তেমনি আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিতা। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অকূল সাগরে পড়ে' আমি কুলকিনারা কিছু না-পেয়ে হাবুডুবু খাই; কিন্তু যখন লীলাময় হরিকে লাভ করি তখন যেন কিনারা পাই।

৩২। ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারের অতীত। তিনি যে আরো কত কী সে কেবল তিনিই জানেন।

৩৩। সাধনার কোনো এক স্তরে সাধক ভগবানের সাকার রূপ দেখে তৃপ্ত হয়, অন্যস্তরে নিরাকার রূপ দেখে।

৩৪। ভগবান সাকার রূপে দেখা দেন; তখন তাঁকে আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো ধরতে-ছুঁতে পারি।

৩৫। ব্রহ্ম কখনো সগুণ, কখনো নির্গুণ, এই যেমন আমি কখনো কাপড় পরে' থাকি, কখনো ল্যাংটা থাকি।

৩৬। জল জমলে যেমন বরফ হয়, তেমনি সাকার মূর্তিতে সচ্চিদানন্দ ঘন

বলে জানবে। যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। মহাসমুদ্রে কেবল অনন্ত জলরাশি, কূলকিনারা কিছুই নেই, কেবল কোথাও কোথাও বেশি ঠাণ্ডায় জমে বরফ হ'য়েছে দেখা যায়। আবার সূর্য উঠলে বরফ গলে যায় আর আগের মতো যেমন জল তেমনি হয়। জ্ঞানসূর্য উদয় হ'লে সেই সাকাররূপ বরফ গ'লে জল হ'য়ে যায় ও নিরাকার হয়।

৩৭। চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম।

৩৮। ভগবান দু'বার হাসেন। ভাই ভাই যখন দড়ি ফেলে ভাগ ক'রে বলে, 'এ-জমি আমার ও-জমি তোমার'। আর রুগি যখন মরে ডাক্তার বলে, 'আমি বাঁচাব।'

৩৯। পাগল, মাতাল, আর বালক-বালিকাদের মুখ দিয়ে অনেক সময় দৈববাণী বের হয়।

৪০। সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক দূরে বলে আমাদের কাছে একখানা ক্ষুদ্র থালার মত দেখায়, ভগবানও তেমনি চৌদ্দ পোয়া নন, তবে দূরত্বের জন্য অমনি দেখায়।

৪১। জানতে, অজানতে বা ভ্রান্তে যে-কোনো ভাবে তাঁর নাম করলেই ফল হবে। যেমন কেউ তেল মেখে নাইতে যায় তারও যেমন স্নান হয় আর যাকে ঠেলে জলে ফেলে দেওয়া যায় তারও স্নান হয়, আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে তার গায়ে জল ফেলে দিলে তারও তেমনি স্নান হয়।

৪২। যে-বাড়িতে হরি সংকীর্তন হয় সে-বাড়িতে কালী প্রবেশ করতে পারে না।

৪৩। কোনো রাজা ব্রহ্মহত্যা ক'রে প্রায়শ্চিত্ত বিধান নিতে ঋষির কাছে গেলেন। ঋষি তখন নাইতে গিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে ছিলেন। ছেলে বলে দিলেন, 'রাম-নাম তিনবার করো গে।' ঋষি এসে শুনে বললেন, 'যে-রাম নাম একবার ক'রলে কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হয়, তুমি সেই নাম তিনবার ক'রতে বলেছ, তুমি চণ্ডাল হও গে।' রামায়ণে সে-ই গুহক চণ্ডাল।

৪৪। অমৃতকুণ্ডে যে-কোনো প্রকারে একবার পড়তে পারলেই অমর হওয়া যায়। তেমনি ভগবানের নাম যে-কোনো প্রকারে নিলে তার ফল হবেই হবে।

৪৫। কলের জাহাজ নিজে অনায়াসে চলে যায়, বড়ো-বড়ো গাধা বোটকেও

টেনে নিয়ে যায়। তেমনি মহাপুরুষ যখন আসেন, তখন তিনি অনায়াসে বদ্ধ লোকদেরও টেনে নিয়ে যান।

৪৬। যখন বন্যা আসে তখন খানা, ডোবা সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বৃষ্টিতে সামান্য নালা দিয়ে কষ্টে জল যায় মাত্র। যখন মহাপুরুষ আসেন, সকলেই তাঁর কৃপায় ত'রে যায়। সিদ্ধ লোক কষ্টে-স্বষ্টে আপনি ঈশ্বর লাভ ক'রে চলে যান।

৪৭। বড়ো-বড়ো বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন কত লোক তার ওপর চ'ড়ে ভেসে যায়। তাতে সে ডোবে না। হাবাতে কাঠে সামান্য একটা কাক বসলেও ডুবে যায়। তেমনি মহাপুরুষ যখন আসেন, কত লোক তাঁকে আশ্রয় ক'রে ত'রে যায়। সিদ্ধলোক নিজে কষ্টেস্বষ্টে যায় মাত্র।

৪৮। রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায়, কত মাল বোঝাই গাড়িও টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরা তেমনি পাপ বোঝাই সংসারী লোকদের ঈশ্বরের কাছে টেনে নিয়ে যায়।

৪৯। যখন শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন কেবলমাত্র সাতজন ঋষি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তেমনি ভগবান যখন অবতার হন সকলে তাঁকে জানতে পারে না।

৫০। জ্যোতির্ময় বৃক্ষে থলো-থলো রাম, থলো-থলো কৃষ্ণ ফল আছে, তার এক-একটি এসে এত কাণ্ড ক'রে যান।

৫১। অবতার ঈশ্বরের কর্মচারী—যেমন জমিদার ও তার নায়েব। আপন অধিকারের যে-প্রদেশে গোলমাল হয়, জমিদার সেই প্রদেশেই তাঁর নায়েবকে পাঠান; তেমনি জগতে যে-কোনো স্থানে ধর্মহানি হয় সেই স্থানেই অবতারকে আসতে হয়।

৫২। সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে যিশু হলেন।

৫৩। অন্য সময়ে কুয়ো খুঁড়ে জল পায়, আর বন্যে এলে যেখানে সেখানে জল। তেমনি অন্য সময় অতি কষ্টে সাধন-ভজন ক'রে ঈশ্বর লাভ হয়, আর যখন অবতার আসেন তখন তাঁর দর্শন যেখানে সেখানে মেলে।

৫৪। সিদ্ধপুরুষ কেমন? তিনি যেন প্রত্নতত্ত্ববিদ্। যেমন কুয়ো আছে, কিন্তু চাপা পড়েছে, তাকে বের করা।

অবতার কেমন? তিনি যেন এঞ্জিনিয়ার। যেমন যেখানে কুয়ো নেই, সেখানে কুয়ো খোঁড়া।

৫৫। ভাগবতের সব কথাকে নিতান্ত নিগূঢ় গুহ্য কথা মনে কোরো না। রাম, সীতা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, অর্জুন—ভেবো না ওঁরা সবাই ইতিহাসের রূপক-কল্পনা। ওঁরা তোমাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ। কিন্তু দিব্যগুণ আছে বলে ওঁদের জীবনের ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক এই দুইভাবেই দেখা যায়।

৫৬। ভগবান দেহধারণ ক'রে অবতাররূপে কতখানি আত্মদান করেন কে তাঁর খবর রাখে?

৫৭। নির্গুণ ব্রহ্ম আর রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির স্বরূপ কেমন? —যেমন সমুদ্র ও তার তরঙ্গ।

৫৮। সিদ্ধ হ'লে কেমন অবস্থা হয়? —যেমন আলু, বেগুন ইত্যাদি সিদ্ধ হ'লে নরম হ'য়ে যায়, সেইরকম মানুষ সিদ্ধ হ'লে নরম হ'য়ে যায়; তার অহংকারাদি কেটে যায়।

৫৯। জগতে পাঁচ রকম সিদ্ধ লোক দেখা যায়: স্বপ্ন-সিদ্ধ, মন্ত্র-সিদ্ধ, হঠাৎ-সিদ্ধ, কৃপা-সিদ্ধ ও নিত্য-সিদ্ধ।

(ক) স্বপ্নসিদ্ধ যাঁরা তাঁরা স্বপ্নের মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা লাভ করেন।

(খ) গুরুর মুখ থেকে মন্ত্রোপদেশ পেয়ে সেই মন্ত্র জপ দ্বারা ক্রমশ চিত্তশুদ্ধি করে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁদের বলা যায় মন্ত্রসিদ্ধ।

(গ) যেমন হঠাৎ কোনো গরিব লোক মাটির ভিতর, কি অন্য উপায়ে টাকা পেয়ে বড়োলোক হ'য়ে যায়, সেই রকম অনেক পাপী লোক হঠাৎ বদলে গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে চলে যায়। এঁরা হঠাৎ-সিদ্ধ।

(ঘ) রাজার দয়ায় যেমন অনেক গরিব লোক বড়ো মানুষ হ'য়ে যায়, তেমনি ঈশ্বরের কৃপায় যাঁরা সিদ্ধ হন তাঁদের বলা হয় কৃপাসিদ্ধ।

(ঙ) লাউ গাছে, কুমড়ো গাছে আগে ফল হয়, তারপর ফুল হয়, নিত্য-সিদ্ধ লোক আগে সিদ্ধ হ'য়ে তারপর সাধনা করে। অবতারাদি নিত্যসিদ্ধ। মনুষ্য-সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তাঁদের যত সাধন-ভজন।

৬০। হোমাপাখি আকাশেই থাকে, মাটির ওপর কখনো আসে না। আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়তে থাকে, কিন্তু এত উঁচুতে থাকে যে, পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখির ছানা বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়তে থাকে।

কিন্তু তখনও এত উঁচু যে পড়তে পড়তে ওর পাখা ওঠে ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যে সে মাটির উপর পড়ে যাবে! মাটিতে পড়লেই মৃত্যু! যেই মাটি দেখা, অমনি মা'র দিকে চোঁচা দৌড়।—শুকদেব, নারদ, যিশু, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি এই হোমাপাখির মতো, ছেলেবেলা থেকেই সংসারের যাবতীয় আসক্তি ত্যাগ ক'রে দিব্যজ্ঞানের উচ্চতম মার্গে উঠে গেছে। এঁরা সবাই নিত্যসিদ্ধ।

৬১। ঈশ্বর কোটি অন্তরঙ্গ, ভগবানের সখা, সহচর, আত্মীয় যেন। জীব কোটি বহিরঙ্গ।

৬২। সাধারণ নারকেলে পেরেক বিঁদলে শাঁস পর্যন্ত বিঁধে যায়, কিন্তু খড়ুলী নারকেলের শাঁস ভেতরে আলগা হ'য়ে থাকে, তাতে পেরেক বিঁদলে শাঁসে লাগে না। যীশুখৃষ্ট খড়ুলী নারিকেলের মতো ছিলেন, তিনি দেহ থেকে ভিন্ন ছিলেন, তাই তাঁকে কষ্ট দিতে পারে নি।

৬৩। এক সময়ে পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক সাধুর পা এক দুষ্ট লোকের গায়ে লেগেছিল। সে রেগে অন্ধ হ'য়ে সাধুকে ভয়ানক মারলে। সাধু অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো। তাঁর শিষ্যেরা নানা মতে তাঁর সেবা করতে-করতে কিছু চৈতন্য হ'লে জিজ্ঞেস করলে, 'বলুন দেখি কে আপনার সেবা করছে?' সাধু বললেন, 'যে আমায় মেরেছিল।' খাঁটি সাধু শত্রু-মিত্রের তফাৎ জানে না।

৬৪। দুধে জল মেশানো থাকলে হাঁস জল রেখে দুধটুকু খায়, অন্য পাখিতে তা পারে না। সেই রকম ঈশ্বর মায়ায় মিশিয়ে আছে, অন্যে তাঁকে আলাদা ক'রে দেখতে পারে না, যাঁরা পরমহংস তাঁরাই মায়াকে ফেলে ঈশ্বরকে নেন।

৬৫। বাতাস চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে নিয়ে যায়, কিন্তু কারো সঙ্গে মেশে না। মুক্ত পুরুষও তেমনি সংসারে থাকেন, কিন্তু সংসারের সঙ্গে মেশেন না।

৬৬। যেমন পদ্মপত্রে জল ও পঙ্কলিপ্ত পাঁকাল মাছ, মুক্ত পুরুষেরাও সেই রকম।

৬৭। পোলের নিচে সহজে জল আসে যায়, জমে না; তেমনি মুক্ত লোকদের হাতে যেই টাকা পয়সা আসে অমনি খরচ হ'য়ে যায়, জমে না।

৬৮। দড়ি পুড়ে গেলে আকার থাকে বটে, কিন্তু তাতে বাঁধা চলে না। সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের অহংকারও সেইরূপ।

৬৯। পানকৌড়ি জলে থাকে বটে, কিন্তু পাঁক তার গায়ে লাগে না। মুক্ত পুরুষেরাও সেই রকম, সংসারে লিপ্ত হয় না।

৭০। পাঁঠা কাটলেও যেমন খানিকক্ষণ ধড়ফড় করে অহংকারও তেমনি গিয়েও যায় না। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যে অহংকার নিয়ে সংসারে বিচরণ করেন তাও তেমনি অর্থাৎ জীবনশূন্য। তাতে আর তাঁদেরকে কাম-কাঞ্চনে আবদ্ধ করতে পারে না।

৭১। খাঁটি সোনার গড়ন হয় না, একটু পান (খাদ) দিতে হয়। সেই রকম মায়াহীন জীবন্মুক্ত মানুষের একুশ দিনের অধিক জীবন থাকে না। দেহ থাকলে একটু মায়া থাকে।

৭২। লুকোচুরি খেলায় বুড়ি ছুঁলেই আর চোর হয় না, সেই রকম ঈশ্বর ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। যে-বুড়ি ছুঁয়েছে সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে তাকে আর চোর করবার যো নেই। সংসারেও সেই রকম ঈশ্বরকে ছুঁতে পারলে আর ভয় থাকে না। যিনি ঈশ্বরকে ছুঁয়েছেন, সংসারে সকল অবস্থাতেই তিনি নিরাপদ থাকেন, কিছুতেই তাঁকে আর বদ্ধ করতে পারে না।

৭৩। লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোনা হয়, তাকে মাটির ভেতর রাখো আর আস্তাকুঁড়েই ফেলে রাখো, সোনাই থাকবে, লোহা হবে না। যিনি ঈশ্বর পেয়েছেন তাঁর অবস্থা সেই রকম। তিনি সংসারেই থাকুন আর বনেই থাকুন, তাঁর গায়ে আর কিছুতেই দাগ লাগবে না।

৭৪। লোহার তরবারে স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোনার তরবার হয়, কিন্তু গড়নটা সেই রকমই থাকে, তবে কিনা তাতে আর হিংসার কাজ চলে না। তেমনি ঈশ্বরকে ছুঁলে আকার সেই রকমই থাকে, কিন্তু তার দ্বারা আর অন্যায় কাজ হয় না।

৭৫। সমুদ্রের ভিতরে লুকানো চুম্বক পাথর যেমন হঠাৎ জাহাজের লোহার পেরেক খুলে ফেলে তাকে খণ্ড-খণ্ড ক'রে ডুবিয়ে দেয়, সেই রকম জ্ঞান-চৈতন্য উদয় হ'লে অহংকার ও স্বার্থপূর্ণ জীবনকে মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড-খণ্ড ক'রে ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

৭৬। জল ও দুধ এক সঙ্গে রাখলে মিশে যায়, দুধ আর আলাদা থাকে না। ধর্মপিপাসু নবীন সাধক সংসারে সকল রকম লোকের সঙ্গে মিশলে আপনার ধর্মও

হারিয়ে ফেলে, তার আগেকার বিশ্বাস-ভক্তি-উৎসাহ কোথায় চলে যায়, সে কিছুই টের পায় না।

৭৭। গৃহস্থের বৌ নানা রকম সংসারের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, সন্তান হবার সময় হ'লে সমস্ত কাজ ছেড়ে দেয়। প্রসব হ'লে তার আর অন্য কাজ-কর্ম করতে ভালো লাগে না, তখন সে সমস্ত দিন কেবল আপনার ছেলেটিকে লালন-পালন ক'রে ও তার মুখচুম্বন ক'রে আনন্দ পায়। মানুষও অজ্ঞান অবস্থায় নানা কাজ করে, কিন্তু ঈশ্বর দর্শন পেলে আর সে কাজ ভালো লাগে না, তখন সে তাঁর কাজ ছাড়া অন্য কাজে সুখ পায় না, আর তাঁকে এক মুহূর্তও ছাড়তে চায় না।

৭৮। হাট হ'তে দূরে থাকলে কেবল হাটের হো-হো শব্দ শুনতে পায়, কিন্তু হাটের ভিতর ঢুকলে আর সে শব্দ শুনতে পায় না, তখন স্পষ্ট শুনতে পায় : কেউ আলু চাইছে, কেউ পটল চাইছে। ঈশ্বর হ'তে দূরে থাকলে কেবল তর্ক যুক্তি মীমাংসার গোলমালের মধ্যে প'ড়ে থাকতে হয় ; কিন্তু তাঁর কাছে যেতে পারলে আর তর্ক-মীমাংসা থাকে না, তখন সবই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

৭৯। যে মুসলমান 'আল্লাহো' 'আল্লাহো' ক'রে চিৎকার করছে, জেনো সে আল্লাকে পায়নি—যে পেয়েছে সে চুপ ক'রে ব'সে আছে।

৮০। মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারদিকে গুন্ গুন্ করে ততক্ষণ সে মধু পায়নি। মধু পেলে সে আর গুন্ গুন্ করে না, চুপ ক'রে মধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম নিয়ে গোল করে ততক্ষণ সে ধর্মের আস্বাদ পায়নি, পেলে চুপ করে যায়।

৮১। ছোটো ছোটো ছেলেরা ঘরের ভিতর বসে আপন মনে পুতুল খেলছে, কোনো ভাবনা নেই ; কিন্তু যেই মা এলো অমনি সকলে পুতুল ফেলে 'মা, মা' বলে কাছে দৌড়ে গেল। তোমরাও এখন ধন মান যশের পুতুল নিয়ে সংসারে নিশ্চিন্ত মনে সুখে খেলা করছো, কোনো ভয়-ভাবনা নেই ; যদি মা আনন্দময়ীকে তোমরা একবার দেখতে পাও, তা হ'লে আর তোমাদের ধন মান যশ ভালো লাগবে না, সব ফেলে তাঁর কাছে দৌড়ে যাবে।

৮২। ন্যাংটা তোতাপুরী বলতো, 'ঘটি রোজ না মাজলে কলঙ্ক পড়ে।' অর্থাৎ রোজ-রোজ ধ্যান না করলে চিত্ত অশুদ্ধ হয়। পরমহংসদেব উত্তরে বললেন, 'যদি সোনার ঘটি হয় তাহ'লে আর পড়ে না।' অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করলে আর সাধনার দরকার হয় না।

৮৩। ওলা-মিছরির স্বাদ যে পায় সে কি আর চিটে গুড় খেতে চায়, না যে একবার তেতলায় শয়ন করেছে সে আর ময়লা স্থানে থাকতে পারে? ব্রহ্মানন্দ যে পায়, সে কি আর বিষয়ানন্দে মাতে?

৮৪। যে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে সে কি সামান্য মুটের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে সুখ পায়? যে ভগবান পেয়েছে তার মন সামান্য জিনিসে যায় না।

৮৫। পাহাড়ে উঠতে গেলে তার তলায় বড়ো-বড়ো শাল গাছ ও ছোটো-ছোটো ঘাস দেখে মনে হয়, ঘাস কী ছোটো! শাল গাছ কত বড়ো। পরে সে পাহাড়ের ওপর উঠে ছাখে, ঘাস আর শাল গাছ সমান হ'য়ে গেছে। সেই রকম পার্থিব দৃষ্টিতে বাপ-মা কত বড়ো, কিন্তু ঈশ্বর-দৃষ্টি লাভ করলে সকলেই সমান হ'য়ে যায়।

৮৬। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ। কলসী পূর্ণ হ'লে কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে আর শব্দ থাকে না। যে ভগবান পায়নি সে-ই ভগবান সম্বন্ধে নানা গোল করে আর যে তাঁর দর্শন পেয়েছে সে স্থির হ'য়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে।

৮৭। মেয়েরা রাত্রে স্বামীর সঙ্গে কী কথা ক'য়েছে, কারো কাছে বলে না, কোনো রকমে প্রকাশ হ'লে লজ্জা পায়, কিন্তু নিজের সমবয়সীদের কাছে সব বলে। ঈশ্বরের ভক্ত যে-ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, আলাপ করে প্রাণে যে ভাব হয়, যার-তার কাছে বলতে চায় না—বলে সুখ পান না। কিন্তু ভক্তের কাছে প্রাণ খুলে সব কথা বলেন, বলেও সুখ পান আর বলবার জন্যে ব্যাকুল হন।

৮৮। পতঙ্গ একবার আলো দেখলে আর অন্ধকারে যায় না, পিঁপড়ে গুড়ে প্রাণ দেয়, তবুও ফেরে না। ভক্তও সেই রকম ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দেয়, তবুও অন্য কিছু চায় না।

৮৯। মা বলতে ভক্ত এত মত্ত হন কেন? মা'র কাছে যে আব্দার বেশি। সন্তানের কাছে মা আর মায়ের কাছে সন্তান যত প্রিয় যত আপন যত নিঃসংকোচ এমন আর-কেউনা, কোথাও না।

৯০। একা গাঁজা খেয়ে গাঁজাখোরের সুখ হয় না। ভক্তও গাঁজাখোরের মতো একা নাম ক'রে তেমন আনন্দ পায় না।

৯১। গরুর দলে অন্য জন্তু ঢুকলে গরুরা তাকে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়,

কিন্তু গরু এলে সকলে তার গা চাটাচাটি করে। সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁরা উভয়ে আনন্দ পান ও সে-সঙ্গ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু অভক্ত এলে তার সঙ্গে মেশেন না।

৯২। সাধকের বল কী?—ছেলেদের মতো সাধকের কান্নাই বল।

৯৩। বাঁদরের বাচ্চা আপনার মা-কে জড়িয়ে থাকে, কিন্তু বেড়ালের ছানা পড়ে'-পড়ে' কেবল ম্যাঁও ম্যাঁও ক'রে ডাকে। বাঁদরের বাচ্চা যদি হাত ছেড়ে দেয় তাহ'লে পড়ে যায়, কারণ সে নিজে মাকে ধ'রে আছে। আর বেড়ালের ছানাকে মা মুখে ক'রে ধ'রে থাকে, তার আর পড়বার ভয় নেই। প্রথমটি পুরুষকার, শেষটি নির্ভর।

৯৪। সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সর্বদা হাঁ ক'রে জলের ওপর ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়লে তারা মুখ বন্ধ ক'রে একেবারে জলের নিচে চলে যায়, আর উপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুপ্তমন্ত্র-রূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।

৯৫। চকমকি পাথর শত বৎসর জলের ভেতর পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না। তুলে লোহার ঘা মারলেই আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত, হাজার হাজার অপবিত্র সংসারীর ভেতর পড়ে থাকলেও তাঁর বিশ্বাস-ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎ কথা হ'লেই সে উন্মত্ত হয়।

৯৬। পাথর হাজার বছর জলের মধ্যে থাকলেও তার ভিতর জল ঢোকে না, কিন্তু মাটিতে জল লাগলে তখুনি গলে যায়। বিশ্বাসী হৃদয় হাজার হাজার পরীক্ষার মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষ সামান্য কারণেই টলে যায়।

৯৭। বালকের স্বভাব যেমন টাকা কড়ি ফেলে পুতুল নেয়, বিশ্বাসী ভক্তও তেমনি। বিশ্বাসী ভক্ত ছাড়া, সংসারের ধন-মান ফেলে ঈশ্বরকে কেউ নিতে চায় না।

৯৮। ঈশ্বর যেন চিনির পাহাড়; তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষুদে পিঁপড়ে একটি ছোটো দানা নিলে। ডেঁও পিঁপড়ে না-হয় তার চেয়ে একটু বড়ো দানা নিলে, কিন্তু পাহাড় যেমন তেমনি রইলো। ভক্তেরা সেই রকম তাঁর একটা ভাব নিয়ে মেতে যায়, কেউ তাঁর সব ভাব নিতে পারে না।

৯৯। একদিন এক তার্কিক রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞেস করলেন: 'বলুন তো জ্ঞান কাকে বলে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু কী?' তদুত্তরে তিনি বললেন: 'ঐ সব সূক্ষ্ম কূট কপালে জানিনে বাপু। আমি কেবল আমার জগত্তারিণী মা-কে জানি, আর জানি, আমি তাঁর ছেলে।'

১০০। ভগবানের কথায় যাঁর গা রোমাঞ্চ হ'য়ে ওঠে ও চক্ষে ধারা পড়ে, সেইটি তাঁর শেষ জন্ম বুঝতে হবে।

১০১। দাদ যত চুলকাও তত চুলকাতে ইচ্ছা হবে ও চুলকে সুখ হয় ভক্তেরাও তেমনি ভগবানের গুণকীর্তন ক'রে কখনো পরিতৃপ্ত হন না।

১০২। ভক্তের ভাবের শেষ হয় না কেন? মহাজনের গোলাতে যখন ধান-চাল মাপে, তখন মেয়েরা ধামা-ধামা ক'রে মাল এগিয়ে দেয়, কিন্তু মুদিখানায় তেমনটি হয় না, তার ভাঁড়ারও অফুরন্ত নয়। তেমনি ভগবানও ভক্তের ভাব জুগিয়ে দেন, এ-জন্য ভক্তের ভাব ফুরোয় না। কিন্তু বই পড়া জ্ঞানীর জ্ঞান দু'দিনে ফুরিয়ে যায়।

১০৩। খানদানী চাষা বারো বৎসর অনাবৃষ্টি হ'লেও চাষ দিতে ছাড়ে না। ঠিক বিশ্বাসী সমস্ত জীবনে তাঁর দর্শন না-পেলেও তাঁকে ছাড়ে না।

১০৪। যে খাঁটি ভক্ত দিব্য প্রেমের অমৃত আকণ্ঠ পান করেছে সে তো খাঁটি মাতালের তুল্য। আর সেইজন্যই তো বিহিত নিয়মকানুন মেনে চলা তাঁর পক্ষে সব সময় সম্ভব হয়না।

১০৫। স্রোতের জলে দল হয় না, গেড়ে ডোবার বদ্ধ জলে দল হয়। যার মন ঈশ্বর পাবার জন্য দৌড়েছে তার আর কোনো দিকে দৃষ্টি থাকে না। যে মান-সম্ভ্রমের দিকে চেয়ে আছে সে-ই দল বাঁধতে যায়।

১০৬। যোগী-সন্ন্যাসীরা সাপের জাত। সাপ নিজের জন্য কখনো গর্ত করে না, ইঁদুরের গর্তে থাকে, একটা গর্ত ভাঙলে আরেকটায় যায়। যোগী-সন্ন্যাসীরাও সেই রকম নিজের জন্য ঘর করেন না। পরের ঘরে আজ এখান কাল সেখান ক'রে দিন কাটিয়ে দেন।

১০৭। সাধু হ'লেই সাধুকে চিনতে পারে। যে সুতোর কাজ করে, সে সুতো দেখলেই কোন্ নম্বরের সুতো বলে দিতে পারে।

১০৮। একজন সাধু সমাধিস্থ হ'য়ে রাস্তার ধারে প'ড়ে আছেন। এমন সময় একজন চোর দেখে আপনাআপনি বলতে লাগলো: 'এ নিশ্চয় চোর, সমস্ত

রাত্রি চুরি ক'রে এখন পড়ে আছে, এখনি পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে, 'আমি পালাই।' একজন মাতাল দেখে বললে : 'সমস্ত রাত্রি মদ্‌টদ্‌ টেনে খানায় পড়ে আছে, আমি পড়চিনি বাবা।' শেষে একজন সাধু দেখে চিনলে যে, ইনি সমাধিস্থ হ'য়ে প'ড়ে আছেন ও তাঁর পদসেবা করতে লাগলেন।

১০৯। রাণী রাসমণির কালী বাড়িতে এক সময় একজন পাগল সাধু এসে-ছিলেন। তিনি একটা কুকুরকে একখানা এঁটো পাতে খেতে দেখে তার কান ধ'রে 'তোম্‌ খাতা হম্‌কো নেহি দেতা' বলে তার সঙ্গে খেতে ব'সে গেলেন। লোকেরা স্বভাবত তাঁকে পাগল বলে ধ'রে নিয়েছিল। কিন্তু তারপর তিনি মা কালীর মন্দিরে গিয়ে এমনি স্তব করেছিলেন যে, মন্দির যেন কেঁপে উঠেছিল। লোকেরা তখন তাঁকে সাধু বলে চিনলো। সিদ্ধ পুরুষেরা সংসারে বালকবৎ, পিশাচবৎ এবং উন্মাদবৎ বিচরণ করেন।

১১০। সকলের অসমক্ষে যিনি অন্যায় বা অধর্মাচরণ না করেন তিনিই যথার্থ ধার্মিক।

১১১। সকল বর্ণ এক-একটা, কিন্তু 'শ' তিনটে—শ, ষ, স। যত পারো সয়ে যাও। এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে সহ্যগুণ এতই প্রয়োজন যে, মানুষকে প্রথমাবধি সহ্যগুণ শিক্ষা দেবার জন্যেই যেন বর্ণমালায় তিনটি শ, ষ, স ধরা হ'য়েছে।

১১২। চিনি আর বালিতে মিশে থাকলে পিঁপড়ে বালি ফেলে চিনি নেয়। পরমহংস ও সৎ লোকের এই লক্ষণ।

১১৩। কুলোর স্বভাব মন্দ ফেলে ভালো রাখা। সৎ লোকেরও এই স্বভাব।

১১৪। সত্যকার সাধু ব্যক্তি নির্বিকার (অর্থাৎ রিপুরহিত) অবস্থায় বিচরণ করেন।

১১৫। পার্থিব লাভের আশায় সংসারীরা অনেক রকম ধর্ম-কর্ম ক'রে থাকে। কিন্তু বিপদ, দুঃখ, দারিদ্র্য এলে তারা সব ভুলে যায়। পাখি সমস্ত দিন 'রাধাকৃষ্ণ' বলে, কিন্তু বেড়ালে ধ'রলে কৃষ্ণনাম ভুলে ক্যাঁ ক্যাঁ করতে থাকে।

১১৬। স্প্রীঙের গদির উপর বসলেই নুয়ে যায়, উঠলেই আবার তেমনি সমান হ'য়ে যায়। সন্ন্যাসী মানুষের সেই রকম, যখন ধর্মকথা শোনে তখন ধর্মভাব হয়, কিন্তু সংসারে ঢুকলেই সব ভুলে যেমন তেমনি হ'যে পড়ে।

১১৭। যেমন কামারশালে লোহা যতক্ষণ হাপোরে থাকে ততক্ষণ লাল থাকে, হাপোর থেকে বার করলেই কালো হ'য়ে যায়, সেই রকম সংসারী মানুষ যতক্ষণ ধর্ম মন্দিরে বা ধার্মিক লোকদের কাছে থাকে ততক্ষণ ধর্মভাবে পূর্ণ থাকে, বাইরে এলেই সে ভাব চ'লে যায়।

১১৮। একজন বললেন: 'আমার ছেলে হরিশ বড়ো হ'লে তার বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার ওপর রেখে আমি যোগ সাধন করবো।' তদুত্তরে একজন সাধু বললেন: 'তোমার কোনো কালে সাধনা হবে না। হরিশ-গিরিশ বড়ো নেওটা, ছাড়ে না। পরে সাধ হবে, হরিশের ছেলে হোক ও সে ছেলের আবার বিয়ে হোক, তারপর।

১১৯। গুয়ে মাছি কখনো কখনো ময়রার দোকানের সন্দেশের উপর গিয়ে বসে; আবার কোনো মেথরানি গুয়ের ভার নিয়ে যদি সেই পথ দিয়ে যায় তবে সে সন্দেশ ছেড়ে উড়ে গিয়ে সেই গুয়ের উপর বসে। কিন্তু মৌমাছি শুধু মধু পানেই মত্ত থাকে। সংসারী জীবও সেই রকম কখনো হরির কথা শোনে, আবার কখনো বিষয়ে মত্ত হয়।

১২০। নির্লিপ্ত সংসারী কেমন?—বাড়িতে একটি গরীব ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করতে গেছে, তা বাড়ির কর্তাটি নির্লিপ্ত সংসারী অর্থাৎ নিজ হাতে একটি পয়সা রাখেন না—সব স্ত্রীর হাতে দেন। বাবু বললেন, 'তা ঠাকুর, আমি তো পয়সা-কড়ি ছুঁই না, আমায় মিছে বলা।' ব্রাহ্মণ নাছোড়বান্দা, অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে ধরলেন। বাবুটি মনে-মনে ভাবলেন, একটা টাকা না-নিয়ে ছাড়বে না। প্রকাশ্যে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কাল আসবেন, যা হয় হবে।' পরে বাড়ির মধ্যে গিয়ে বললেন, 'দেখ, একটি গরীব ব্রাহ্মণ ভারি বিপদে পড়েছে, তাকে একটি টাকা দিতে হবে।' স্ত্রী টাকার কথা শুনে জ্বলে গিয়ে বললে, 'ওঃ, কী দাতাই হয়েছেন! টাকা অমনি শাক-পাতা কিনা দিলেই হ'লো।' বাবুজী আমতা-আমতা ক'রে বললেন, 'গরীব মানুষ, অনেক ক'রে ধ'রেছে, একটা টাকা না-দিলে চলে না।' স্ত্রী বললে, 'তা হবে না, টাকা আমি দিতে পারবো না।' বাবুজী তখন অনেক জেদ করাতে স্ত্রী বললে, 'তবে এই একটা দুয়ানি আছে, নিয়ে যাও। বাবুজী নির্লিপ্ত সংসারী, অগত্যা স্ত্রী যা হাতে তুলে দিলে ব্রাহ্মণকে তাই-ই এনে দিলেন।

১২১। ঘুর্ণির ভেতর চিক্‌'চিক্‌ ক'রে জল যায় দেখে পুঁটি মাছগুলো আনন্দে তার ভেতর ঢুকে যায়; কিন্তু তারা আর বেরোতে পারে না, একেবারে প্রাণে মরে। সংসারের বাহ্য চাকচিক্য দেখে লোকে তার ভিতর ঢুকে মারা পড়ে। ঘুর্ণির মতো সংসারে ঢোকা সহজ, কিন্তু বেরুনো দায়।

১২২। লোকে জনক রাজার কথা বলে। তিনি সংসারে থেকেও ঈশ্বর লাভ করেছিলেন, জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন। কিন্তু সমগ্র মানবেতিহাসে জনক রাজার দৃষ্টান্ত একটি আছে। এটা কোনো নিয়ম নয়, এটা ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়ম এই যে, কাম-লোভ দেহ-বুদ্ধি ত্যাগ না-করলে ঈশ্বরলাভ হয় না। নিজেকে জনক রাজা ভেবো না শতাব্দীর পর শতাব্দী গেল, পৃথিবীতে জনক রাজা আর দ্বিতীয়টি জন্মালো না।

১২৩। এ-সংসার যেন যাত্রার মঞ্চ, এখানে নানা লোকের নানা পালা, নানা সাজ। পালা শেষ না হ'লে সাজটা ছাড়তে চায় না। তাই হোক, ভোগ-বাসনা ক্ষয় হ'লে সাজটা আপনি খসে পড়বে।

১২৪। ভিজে দেশলাই হাজার ঘসলেও জ্বলে না, কেবল ধোঁয়া ওঠে; কিন্তু শুকনো দেশলাই একটু ঘসলেই দপ ক'রে জ্বলে ওঠে। ভক্ত শুকনো দেশলাইয়ের মতো, হরির প্রসঙ্গ হলেই তাঁর প্রাণে প্রেমাগ্নি জ্বলে ওঠে। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত মন ভিজে দেশলাইয়ের মতো, হাজার হরি কথায়ও উত্তপ্ত হয় না।

১২৫। পাথরে যেমন জল ঢোকে না, সেই রকম বদ্ধজীব ধর্মকথা শোনে না।

১২৬। পাথরে যেমন পেরেক বসে না, মাটিতে বসে, সাধুর উপদেশ তেমনি বদ্ধজীবের ভেতর ঢোকে না, বিশ্বাসী হৃদয়ে সহজে ঢোকে।

১২৭। যেমন নরম মাটিতে ছাপ পড়ে কিন্তু পাথরে পড়ে না, সেই রকম ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের কথা বসে, বদ্ধজীবে বসে না।

১২৮। বদ্ধজীব হরিনাম আপনি শোনে না, পরকেও শুনতে দেয় না—ধর্মসমাজ ও ধার্মিকদের নিন্দা করে এবং উপাসনা করলে ঠাট্টা করে।

১২৯। সাঁকোর জল যেমন এক দিক দিয়ে আসে এবং আরেক দিক্‌ দিয়ে বেরিয়ে যায়, সংসারী বদ্ধজীবদের পক্ষে ধর্ম কথাও সেই রকম। এক কান দিয়ে শোনে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

১৩০। পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজ্‌গজ্‌ করে, সেই

রকম বদ্ধজীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয়-বাসনা তাদের ভিতর গজ্ গজ্ ক'রছে। বিষয়ই তাদের ভালো লাগে, ধর্মকথা ভালো লাগে না।

১৩১। যতক্ষণ জ্বাল দেয়া যায় ততক্ষণই দুধ উত্লে ওঠে। জ্বাল টেনে নিলেই যেমন তেমনি। সাধনা অবস্থাও ঐ রকম।

১৩২। রাজার কাছে যেতে হ'লে সেপাই-শান্ত্রীর অনেক খোসামোদ করতে হয়। ঈশ্বরের কাছে যেতে হ'লে নানা উপায়ে সাধন ভজন ও সৎসঙ্গ করতে হয়।

১৩৩। নিজের ভাব-বিশ্বাস নিজের মধ্যেই রাখতে হয়, অন্যকে বলতে নেই।

১৩৪। নুনের পুতুল, কাপড়ের পুতুল ও পাথরের পুতুলকে সমুদ্রে ফেলে দিলে নুনের পুতুল একেবারে গলে যায়, তার অস্তিত্ব থাকে না। কাপড়ের পুতুলে জল ঢোকে বটে কিন্তু সে জলের সঙ্গে মেশেনা, ইচ্ছে করলে তাকে জল থেকে ভিন্ন করা যায়। পাথরের পুতুলে জল কোনো মতে ঢোকে না। মুক্ত জীব নুনের পুতুলের মতো, সংসারী জীব কাপড়ের পুতুলের সমান, আর বদ্ধজীব পাথরের পুতুলের মতো।

১৩৫। কতকগুলো মাছ জালে আটকালে আদপে পালাবার চেষ্টা করে না, অমনি প'ড়ে থাকে; আবার কতক মাছ পালাবার জন্য লম্ফঝম্ফ করে, কিন্তু পালাতে পারে না; আবার আরেক জাতীয় মাছ আছে যারা জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। আবার দু'চারটে মাছ এমনি সেয়ানা যে কখনো জালে পড়ে না। তেমনি সকল জীব সমান হ'লেও অবস্থাভেদে জীব চার রকম: বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

১৩৬। চালুনির স্বভাব ভালো ফেলে দেয়া আর মন্দ রাখা। অসতের স্বভাব তেমনি।

১৩৭। এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গেছে। তার ভিতর যার বিষয়-বুদ্ধি বেশি সে ঢুকেই বাগানে ক'টা আম গাছ, কোন গাছে কত আম হয়েছে, বাগানটির কত দাম হ'তে পারে, এই রকম বিচার করতে লাগলো; অপরজন মালির সঙ্গে ভাব ক'রে গাছতলায় ব'সে একটি ক'রে আম পাড়তে লাগলো আর খেতে লাগলো। এখন কে বেশি বুদ্ধিমান? আম খাও, পেট ভরবে, কেবল পাতা গুণে কিংবা হিসাব-কিতাব ক'রে লাভ কী? যাঁরা জ্ঞানাভিমানী তাঁরা শাস্ত্রীয় মীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই

ব্যস্ত থাকেন, বুদ্ধিমান লোক ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব ক'রে এ-সংসারে পরমানন্দ ভোগ করেন।

১৩৮। শকুনি অনেক ঊর্ধ্বে ওড়ে, কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে। পুঁথি পড়া পণ্ডিতেরা অতি উঁচু-উঁচু জ্ঞানের কথা বলে বটে কিন্তু তাঁদের মন থাকে অসার চাল-কলা ধন-মানের উপর।

১৩৯। শিব বড়ো কি বিষ্ণু বড়ো, তা-ই নিয়ে বর্ধমানের মহারাজার দরবারে একবার পণ্ডিতদের মধ্যে ঘোরতর তর্ক উঠলো। কেউ বললো শিব, কেউ বললো বিষ্ণু। কলহ যখন প্রবল আকার ধারণ করলো এমন সময় এক জ্ঞানী পণ্ডিত মহারাজকে বললেন: 'মহারাজ, শিব কিম্বা বিষ্ণু কারো সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই, এ-অবস্থায় কে বড়ো তা কেমন ক'রে বলি?' এই কথায় কলহের অবসান হলো, কেন না কেউই তো দেবতাদের দেখেন নি। দেব-দেবীর একের সঙ্গে অপরের তুলনা করা ঠিক নয়। যিনি ঈশ্বর-দর্শন করেছেন তিনিই জানেন যে সেই এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত।

১৪০। যেমন হাতির দাঁত বাইরে এক রকম, ভিতরে আরেক রকম, কপট ধার্মিকের ভাবও তেমনি। মুখে এক, ভিতরে অন্য রকম।

১৪১। যে-সাধু ওষুধ দেয় আর নেশা করে সে ঠিক সাধু নয়; তাঁর সঙ্গ করা উচিত নয়।

১৪২। এক ব্রাহ্মণ একটি বাগান করেছিল। সে দিনরাত তার পোঁদে লেগে থাকতো। একদিন একটা গরু এসে বামুনের অনেক যত্নের একটা গাছ খাচ্ছিলো। ব্রাহ্মণ তা-ই দেখে রেগে অন্ধ হ'য়ে গরুটাকে বেদম মারলে। গরুটা মরে গেল। সকলেই গো-হত্যার জন্য ব্রাহ্মণকে দোষ দিতে লাগলো। ব্রাহ্মণ কিন্তু আপনার দোষ স্বীকার করে না। সে বলে, আমার দোষ কী? আমি গো-হত্যা করি নি, আমার হাত মেরেছে, তা হাতের দেবতা ইন্দ্রই এ-কাজ করেছে। অতএব গো-হত্যার জন্য যদি কারো পাপ হ'য়ে থাকে তবে সে-পাপ ইন্দ্রের হয়েছে—আমার কী দোষ? ইন্দ্র দেখলেন, মহা বিপদ। অতএব তিনি এক বামুনের বেশ ধ'রে সেই বাগানে গিয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন: 'এ বাগানটি কার মশাই?'

ব্রাহ্মণ বললেন: 'আমার।'

ইন্দ্র—বেশ বাগান, আপনার মালিটিও ভালো, দেখুন দেখি কেমন সাজিয়ে গাছগুলি পুঁতেছে!

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে ও-সব আমিই দাঁড়িয়ে থেকে পুঁতিয়েছি।

ইন্দ্র—বটে, বটে, তা আপনার বাগানের রাস্তাটিও বেশ হয়েছে! এগুলে কারা করেছে?

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে ও-সবই আমার করা।

ইন্দ্র—বটে, বটে, সবই আপনার করা, তবে খালি গরুটা মারবার বেলাই বুঝি ইন্দ্র এসেছিল?

১৪৩। যদি কারো ঠিক ঠিক সাধনার দরকার হয়, তিনি তার সদ্গুরু জুটিয়ে দেন। ঐকান্তিকতাই একমাত্র জরুরি জিনিস।

১৪৪। যেমন কোনো অচেনা জায়গায় যেতে হ'লে যে জানে এমন একজনের কথামতো চলতে হয়, অনেককে জিজ্ঞেস করলে পথ গোল হয়ে যায়; ঈশ্বরের কাছে যেতে গেলে তেমনি গুরুর কথামতো চলতে হয়। এ-জন্য একজন গুরুর দরকার।

১৪৫। ব্যাকুল প্রাণে যে তাঁকে ডাকে, তার কিছুই দরকার নেই। কিন্তু সচরাচর সে-রকম ব্যাকুলতা দেখা যায় না বলেই গুরুর দরকার হয়। গুরু এক কিন্তু উপগুরু অনেক হ'তে পারে। যাঁর কাছে কিছু শিক্ষা পাই তিনিই উপগুরু। অবধূত এই রকম চব্বিশটি উপগুরু করেছিলেন। *

১৪৬। কলকাতায় যাবার অনেক রাস্তা। একজন অচেনা লোক কলকাতার রাস্তা আরেকজনকে জিজ্ঞেস করায় সে বললে, এই পথে যাও। খানিক গিয়ে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করায় সে আরেকটা পথ বলে দিল। এইভাবে অনেকে অনেক পথ বলে আর সে খানিক গিয়ে অন্য পথে যায়। তার কলকাতায় পৌঁছনো হ'লো না, সে খালি ঘুরে মরলো। যদি কলকাতায় যেতে চাও, যে জানে এমন একজনের কথায় চলো। সেই রকম ঈশ্বরের কাছে যেতে চাও তো একজনের কথা মতো চলো, না-হ'লে ঘুরে মরবে।

১৪৭। যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ি যায়,
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

শিষ্য গুরুর কোনো কাজ দেখবে না, তিনি যা আজ্ঞা করেন নতশিরে তাই পালন করবে।

১৪৮। গুরু যেন কোটনা। তিনি মানুষে ও ঈশ্বরে মিলিয়ে দেন।

* ভাগবৎ ১১ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক থেকে ৮ম ও ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৪৯। ঝিনুক থেকে মুক্তো বার ক'রে নিয়ে ঝিনুক না-হয় ফেলে দাও। গুরু যে-মন্ত্র দিয়েছেন বিনা যুক্তি-তর্কে তা-ই নিয়ে ডুবে যাও।

১৫০। যেমন চাঁদা মামা সকলকার মামা, সেইরূপ এক ভগবানই সকলকার গুরু।

১৫১। শিষ্য 'গুরু গুরু' বলে নদী পার হয়ে গেল। গুরু দেখলেন, 'তা-ও তো বটে, আমার নামের এত জোর তা তো আমি আগে জানি নি।' পরদিন গুরু 'আমি আমি' বলতে-না-বলতে অগাধ জলে গিয়ে পড়লেন এবং তখন আপনাকে সামলাতে না-পেরে একেবারে প্রাণে মারা গেলেন। মানুষের বিশ্বাস অলৌকিক কাণ্ড ঘটায়, কিন্তু অহংকারের প্রতিফল মৃত্যু।

১৫২। গুরু মেলে লাখে লাখ, চেলা না মেলে এক।

১৫৩। 'নাক তেরে কেটে তাক' বোল বলা সহজ, হাতে বাজানো কঠিন। তেমনি ধর্মকথা বলা সোজা, কিন্তু কাজে করা ভারি শক্ত।

১৫৪। মুখে বলে ঢোল ঢোল, বাজাতে পারে না একটা বোল। মুখে লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু কাজে একটাও করতে পারে না।

১৫৫। একবার ডাক দেখি মন ডাকার মতন

কেমন শ্যামা থাকতে পারে।

যার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছে তার ঈশ্বর দর্শন হবেই হবে।

১৫৬। পদ্মের পাপড়ি খসে যায়, কিন্তু দাগ থাকে। তেমনি তত্ত্বজ্ঞান হ'লে অহংকার চলে যায়, তবু গিয়েও যায় না, একটু-না-একটু দাগ থাকে। অবশ্য এই দাগে খুব একটা ক্ষতি হয় না।

১৫৭। মানুষের ভেতর দুটো 'আমি' কাজ করছে। একটা 'পাকা আমি', আরেকটা 'কাঁচা'। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, আমার শরীর—এইটে 'কাঁচা আমি'। যা-কিছু দেখছি যা-কিছু শুনছি কিছুই আমার নয়, এ-শরীর পর্যন্ত আমার নয়, আমি নিত্যমুক্ত জ্ঞান-স্বরূপ—এইটে 'পাকা আমি'।

১৫৮। রসুন যে-বাটিতে গোলা যায় শতবার মাজলেও সে বাটির গন্ধ যায় না। আমিত্ব সেইরূপ পাজী জিনিস, গিয়েও যায় না।

১৫৯। নারকেল গাছের বাল্‌দে খসে যায়, কিন্তু দাগ থাকে। শরীর থাকতে আমিত্বও সেইরূপ একেবারে যায় না, একটু-না-একটু দাগ থাকে। কিন্তু এই যৎসামান্য আমিত্ব জীবন্মুক্ত পুরুষকে পুনরায় সংসারে আবদ্ধ করতে পারে না।

১৬০। সূর্য পৃথিবীকে আলো ক'রে রেখেছে। সামান্য একখানা মেঘে সেই সূর্যকে যখন ঢেকে ফ্যালে তখন সে-সূর্য আর দেখা যায় না। তেমনি সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দকে আমরা মায়ার আবরণে দেখতে পাচ্ছি না।

১৬১। কাক ভারি বুদ্ধিমান, তার উড়ুং আছে, পুড়ুং আছে, চুড়ুং আছে, কিন্তু গু খেয়ে মরে। অতি বুদ্ধিরও ঐ দশা।

১৬২। কোনো সময়ে নারদের মনে অভিমান হয়েছিল যে, বুঝি তাঁর মতো আর ভক্ত নেই। ভগবান তা বুঝতে পেরে বললেন: 'নারদ, ওমুক জায়গায় আমার এক ভক্ত আছে, তাকে দেখে এসো।' নারদ সেখানে গিয়ে দেখেন যে, এক চাষা সকালবেলা উঠে একবার হরিনাম ক'রে লাঙল নিয়ে মাঠে চলে গেল; তারপর সমস্ত দিন আপন কাজকর্ম ক'রে রাত্রিকালে আরেকবার হরিনাম ক'রে শুলো। নারদ বললেন: ভালোর ভালো, একে ঠাকুর ভক্ত বললেন কী জন্যে? ভক্তের লক্ষণ তো এতে কিছু দেখলাম না!—তারপর ঠাকুরের কাছে গিয়ে নারদ নিজের মনের কথাটি বললেন। ঠাকুর বললেন: 'নারদ, তুমি এই তেলের বাটিটি হাতে ক'রে গোলক ভ্রমণ ক'রে এসো, কিন্তু দেখ সাবধান, যেন এক বিন্দু তেল না-পড়ে।' ঠাকুরের কথা মতো নারদ তেলপূর্ণ বাটিটা হাতে ক'রে গোলক ভ্রমণ ক'রে এলেন। ঠাকুর বললেন: 'নারদ, গোলক ভ্রমণ করতে-করতে তুমি কতবার আমায় স্মরণ করেছিলে?' নারদ বললেন: 'ঠাকুর, আপনাকে একবারও স্মরণ করতে পারিনি, স্মরণ ক'রবো কী, আপনি যে বাটিটার কানায়-কানায় তেল দিয়েছিলেন, একটু চলতে গেলেই পড়ে যায়। কাজেই ভয়ে-ভয়ে আমাকে তেলের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল, আপনাকে আর স্মরণ করতে পারিনি।' ঠাকুর বললেন: 'নারদ, এক বাটি তেলের ভয়ে তোমার মতো ভক্ত আমাকে ভুলে গেল, আর সে আমার কত বড়ো ভক্ত বলো দেখি! প্রকাণ্ড সংসারের ভার মাথায় নিয়েও সে দিনের মধ্যে তবু দু'বার আমায় স্মরণ করেছিল।'

১৬৩। প্রেম তিন রকম—সামর্থা, সামঞ্জস্যা, সাধারণী। উচ্চ, মধ্যম ও নীচ। উচ্চ—তুমি ভালো থাকলেই হ'লো আমি কষ্ট পাই ক্ষতি নেই। মধ্যম—তুমিও ভালো থাকো, আমিও ভালো থাকি। নীচ—আমি বুঝি কষ্ট পাব? তুমি যেমন ক'রে পারো অমুক জিনিসটা আমায় দাও।

১৬৪। প্রেম-ভক্তিতে সাধক ঈশ্বরকে খুব আত্মীয়ের ন্যায় বোধ করেন, যেমন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলতো—জগন্নাথ বলতো না।

১৬৫। এক জন্মেই ঈশ্বর লাভ করবো। তিন দিনে লাভ করবো। একবার নাম করবো আর লাভ করবো। এই রকম জোর ভক্তি হওয়া চাই। হচ্চে-হবে যে মেদাটে ভক্তি ওটা ভালো না।

১৬৬। এক জ্ঞানী ও এক প্রেমিক সাধক বনের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে পথের মধ্যে একটি বাঘ দেখতে পেলেন। জ্ঞানী বললেন: 'আমাদের পালাবার কোনো কারণ নেই, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা করবেন।' প্রেমিক বললে: 'না ভাই, চলো আমরা পালিয়ে যাই। আমাদের দিয়ে যে-কাজ হ'তে পারে, ভগবানকে কেন আর সে-কাজে মিছিমিছি পরিশ্রম করাবো।'

১৬৭। জ্ঞান—পুরুষ। ভক্তি—স্ত্রীলোক। ঈশ্বরের বাহির বাটিতে জ্ঞান যেতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুরে ভক্তি ছাড়া আর-কেউ যেতে পারে না।

১৬৮। ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঈশ্বরের ভক্তি শেষ পর্যন্ত অভিন্ন। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি একই।

১৬৯। পথে যেতে-যেতে রাত্রি হ'য়ে পড়ায় এক মেছুনি এক মালীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মালী যথাসাধ্য তার সেবা করলে, কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম হ'লো না। শেষে সে বুঝতে পারলো, বাগানের ফুলের গন্ধে তার ঘুম হ'চ্ছে না। সে তক্ষুনি আঁশ-চুপড়িতে জল ছিটিয়ে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ঘুমালো। বিষয়ী বদ্ধজীবেরও মেছুনির মতো সংসারের পচা গন্ধ ছাড়া আর-কিছু ভালো লাগে না।

১৭০। সংসারাসক্তি কেমন? —সংসারাসক্ত লোক ভাঁড়াসে নেউলের মতো। যারা নেউল পোষে তারা দেয়ালের গায়ে একটা ভাঁড় বা কলসী টাঙিয়ে রাখে এবং নেউলের গলায় একগাছা দড়ি বেঁধে দড়ির অপর দিকে একখানা ইট বেঁধে রাখে। নেউল ভাঁড় থেকে এদিক-ওদিক বেড়াতে থাকে, কিন্তু তাড়া পেলে বা ভয় খেলে দৌড়ে গিয়ে ওপরে ভাঁড়ের ভেতর চলে যায়, কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পারে না। তার গলার দড়িতে যে-ইট বাঁধা থাকে তারই ভারে সে নেমে পড়ে। সংসারী লোকও তেমনি দুঃখে কষ্টে প'ড়ে অনেক সময় ঊর্ধ্বে (অর্থাৎ ঈশ্বরে) আশ্রয় নেয়, কিন্তু বেশিক্ষণ সে-ভাবে থাকতে পারে না, সংসাররূপ ইটের ভারে আবার নেমে আসে ও সংসারে মিশে যায়।

১৭১। হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। প্রণব বর্ণের মধ্যে নয়। ভক্তি কামনার মধ্যে নয়। (অর্থাৎ এতে উপকার ছাড়া অপকার নেই, অন্যেতে অপকার মাত্র।)

১৭২। ফল বড়ো হ'লে ফুল আপনি খসে যায়, দেবত্ব বাড়লে নরত্ব থাকে না।

১৭৩। বাছুর বিশবার পড়ে, বিশবার ওঠে, তারপর দাঁড়াতে পারে। সাধনা করতে গেলে তেমনি অনেকবার পড়ে যায়, তারপর সিদ্ধ হয়।

১৭৪। কেউ এক ছটাক মদ খেয়ে মাতাল হয়, কেউ বা দু-চার বোতল মদ খেয়ে মাতাল হয়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অপার আনন্দের সাগর, কিন্তু ভক্তেরা অল্পাধিক পরিমানে তাঁকে উপভোগ ক'রে তৃপ্ত হন।

১৭৫। (ক) যা-কিছু সব আমি। (খ) যা-কিছু সব তুমি। (গ) তুমি প্রভু, আমি দাস।—এর যে-কোন একটা উপলব্ধি হ'লে সিদ্ধ হয়।

১৭৬। কী দিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? তন্, মন ও ধন—এই তিন না-দিলে হবে না।

১৭৭। জীব না-মরলে শিব হয় না, আবার শিব শব না-হ'লে মা আনন্দময়ী তাঁর বক্ষের উপর নৃত্য করেন না।

১৭৮। যাঁর অনুরাগ বা একাগ্রতা অধিক তিনি সহজে ঈশ্বর লাভ করতে পারেন।

১৭৯। সমাধি অবস্থায় মনের ভাব কেমন হয়? জ্যান্ত মাছকে পুকুরে ছেড়ে দিলে তার যেমন আনন্দ হয়।

১৮০। যে ধূলোপড়া জানে সে সাতটা সাপ গলায় জড়িয়ে রাখতে পারে। ঈশ্বর-ভক্তিরূপ ধূলোপড়া শিখে সংসার করো, সংসারে নিরাপদে থাকবে।

১৮১। কলসীতে জল ভ'রে সিকেয় তুলে রাখলে দিনকতক পরে জল শুকিয়ে যায়, কিন্তু জলে ডুবিয়ে রাখলে কোনো কালে শুকোয় না। সেই রকম ঈশ্বরের কাছে যে নিত্য ডুবে থাকে তার প্রেম-ভক্তি শুকোয় না, কিন্তু দু-একদিনের প্রেম-ভক্তিতে যে নিশ্চিন্ত থাকে সিকেয় তোলা জলের মতো তার প্রেমভক্তি দু'দিন পরে শুকিয়ে যায়।

১৮২। মাথার ওপর যখন বক উঠবে তখনই ঠিক ধ্যান হবে।

১৮৩। জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে যেমন কলসীর ভেতরে-বাইরে সর্বত্রই জল, তেমনি সচ্চিদানন্দ সাগরে যে মগ্ন হ'য়েছে সে ভেতরে-বাইরে সর্বত্র কেবল সচ্চিদানন্দকেই দেখতে পায়।

১৮৪। ঈশ্বরের কৃপা হ'লেই সকলেই আপন-আপন ভুল বুঝতে পারবে। এ-কথা জেনে আর মিছে তর্ক কোরো না।

১৮৫। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে পিদ্দিম জ্বাললে তখুনি আলো হয়। হাজার জন্মের পাপ তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

১৮৬। মলয়-বাতাস বইলে যে-গাছে সার আছে সে-গাছে চন্দন হয়; কিন্তু অসার পেঁপে, বাঁশ, কলাগাছে কিছু হয় না। ভগবৎ কৃপা হ'লে যাদের সার আছে তারাই মুহূর্তের মধ্যে বদলে পবিত্র হ'য়ে, ঈশ্বরভাবে পূর্ণ হয়, কিন্তু অসার বিষয়াসক্ত মানুষের কিছু হয় না।

১৮৭। হরির আগমন কিরূপে হয়? —সূর্য উঠবার আগে যেমন অরুণোদয়।

১৮৮। যেমন রাজা কোনো চাকরের বাড়িতে যাবার আগে আপনার ভাঁড়ার থেকে বাড়ির সাজ-সজ্জা ও তাঁর বসবার মতো আসন, খাবার ইত্যাদি পাঠিয়ে দেয়; সেই রকম হরি আসবার আগে নিজের সমস্ত যোগাড় ক'রে ভক্তের বাড়িতে আগে পাঠান। প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা সাধকের হৃদয়ে আগে দেন।

১৮৯। মাঠের জল কেউ ব্যবহার না-করলেও রৌদ্রে আপনি শুকিয়ে যায়। পাপী মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর ক'রে প'ড়ে থাকলে তাঁর দয়াগুণে আপনা-আপনি পবিত্র হ'য়ে যায়।

১৯০। আঁধারে লণ্ঠন হাতে পাহারাওয়ালা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পায় না, তবে যদি পাহারাওয়ালা লণ্ঠনটি আপনার দিকে ফেরায় তবেই সকলে তাকে দেখতে পায়। ভগবানও তেমনি সকলকে দেখতে পান, কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে পায় না; তবে যদি তিনি দয়া ক'রে আপনাকে প্রকাশ করেন তবেই লোকে তাঁকে দেখতে পায়।

১৯১। অনেক মাছ আছে তাদের মেলা কাঁটা বাছতে হয়। আর কোনো কোনো মাছের একটা কাঁটা। তেমনি অনেকের মেলা পাপ আছে, আবার কারো-কারো এক-আধটা আছে মাত্র। ঈশ্বরের কৃপায় সব পাপ পরিশুদ্ধ হ'য়ে যায়।

১৯২। তাঁর কৃপায় পবন রাত-দিনই বইছে, নৌকায় পাল তুলে দাও তবেই তো হাওয়া লাগবে।

১৯৩। সরকারি হাওয়া এলে পাখা ফেলে দিতে হয়। ঈশ্বরের কৃপা হ'লে সাধন-ভজনের দরকার হয় না।

১৯৪। নানা ধর্ম, নানা মত। বিশ্বাস-ভক্তি দিয়ে একটাকে শক্ত ক'রে ধ'রতে হয়। ঈশ্বর লাভ করতে হ'লে বিশ্বাসই একমাত্র চাবিকাঠি।

১৯৫। যার বিশ্বাস আছে, তার সব আছে। যার বিশ্বাস নেই তার কিছুই নেই।

১৯৬। রোগী যদি মনের সঙ্গে জোর ক'রে 'আমার রোগ নেই' এ-কথা বলতে পারে তবে রোগ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' এইটে রোক্ ক'রে বলতে-বলতে ক্রমে জীব মুক্ত হ'য়ে যায়।

১৯৭। রামচন্দ্রকে সেতু বেঁধে সমুদ্র পার হ'তে হ'য়েছিল, আর হনুমান 'জয় রাম' বলে এক লাফে অনায়াসে সমুদ্র পার হ'য়ে গেল।

১৯৮। একজন সমুদ্র পার হ'তে চেয়েছিল। কোনো সাধু তাকে একটু কাগজ দিয়ে বলে দিলেন: 'এর জোরে পার হ'তে পারবে।' সে সমুদ্রের খানিক দূর গিয়ে মনে করলে, দেখি না কাগজের ভেতর কী এমন আছে যার জোরে সমুদ্র পার হ'তে পারি। কাগজ খুলে দেখলে কেবল 'রাম' লেখা। 'ও, এই, আর-কিছু না!' যেমন তার মনে হ'লো অমনি সে ডুবে গেল। ঈশ্বরের নামে বিশ্বাস থাকলে অসম্ভব সম্ভব হয়, কেন না বিশ্বাসই জীবন আর সংশয় মৃত্যুর সমান।

১৯৯। অন্নের জন্য ভাবতে হয়, সাধনা করি কী ক'রে?—যাঁর জন্যে খাটবে তিনিই খেতে দেবেন। যিনি পাঠিয়েছেন তিনি আগেই খোরাকি যোগাড় ক'রে রেখেছেন।

২০০। মুক্তি হবে কবে? —'আমি' যাবে যবে। যখন আমিত্ব নষ্ট হবে তখন মুক্ত হবে।

২০১। ঘুড়ি লক্ষে একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি। যত লোক সাধনা করে সবাই সিদ্ধ হয় না।

২০২। সিসে যেমন পারদের মধ্যে পড়লে দ্রবীভূত হয়, মানুষের মন তেমনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসাগরে পড়লে গলে যায়।

২০৩। বর্তমানকালে যে-ধর্ম প্রচার হ'চ্ছে এ-রকম প্রচার আপনি কেমন মনে করেন? —একজনের আয়োজন, একশত জনকে নিমন্ত্রণ। অল্প সাধনায় গুরুগিরি।

২০৪। প্রকৃত প্রচার কী রকম? —লোককে না-ভজিয়ে আপনি ভজলেই যথেষ্ট প্রচার হয়: যে নিজে মুক্ত হ'তে চেষ্টা করে সে-ই যথার্থ প্রচার করে; যে নিজে মুক্ত শত-শত লোক কোথা থেকে আপনি এসে তার কাছে শিক্ষা নেয়। গোলাপ ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।

২০৫। ওহে প্রচারক মশাই, তুমি চাপরাস পেয়েছ? যেমন প্যায়দা সামান্য লোক, তার চাপরাস আছে বলেই লোকে তাকে মানে, তেমনি তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে চাপরাস (আদেশ, বা প্রেরণা) পেয়েছ কি? যদি না-পেয়ে থাকো তবে তোমার কথা কেউ নেবে না কেন মিছে বকবে!

২০৬। মানুষ—মানহুঁস, অর্থাৎ যার হুঁস হয়েছে তাকেই মানুষ বলা যেতে পারে। (হুঁস অর্থে জ্ঞান লাভ)।

২০৭। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।

২০৮। পাল্লার যে-দিক ভারি হয় সেই দিক নেমে পড়ে, যে-দিক হাল্কা সে-দিক ওপরে উঠে যায়। তেমনি যার সংসার, মান, সম্ভ্রম, টাকাকড়ির নানা ভার সে-ই নেমে পড়ে, আর যার কোনো ভার নেই সে-ই উঠে ঈশ্বরের রাজ্যে যায়।

২০৯। ঈশ্বর সকলকার ভিতর আছেন, কিন্তু সকলে তাঁর ভিতর নেই, এ-জন্যই লোকের এত দুঃখ।

২১০। মানুষের দু'রকম প্রকৃতি আছে। গুরু উপদেশ দিয়ে বললেন: 'বাপু, এ অমূল্য রত্ন, এ-কথা কারো কাছে প্রকাশ কোরো না।' এক প্রকৃতির লোক তা শুনে চুপ মেরে গেল। অপর প্রকৃতির লোকটি ঐ কথা শুনে বললে, 'বটে।' অমনি সে ছাতের ওপর উঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলো: 'ওরে, কে অমূল্য রত্ন নিবি, আয়।' শেষোক্ত প্রকৃতি হলো অবতারের আর প্রথমোক্ত প্রকৃতি সিদ্ধর।

২১১। কোনো লোক একেবারে উপুসী থাকবে না, তবে কিনা কেউ বা নটার সময়, কেউ বা দুটোর সময়, আর কেউবা সন্ধ্যের সময় খায়। সেই রকম জন্মজন্মান্তরে কোনো সময়ে না কোনো সময়ে সকলেই ভগবানকে দেখবে।

২১২। ফল পেকে পড়ে গেলে বড়ো মিষ্টি লাগে, কিন্তু কাঁচা ফল পাড়লে মিষ্টি লাগে না, সুঁটকে যায়; জ্ঞান চৈতন্য হ'লে জাতিভেদ থাকে না, কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে জাতিভেদ বড়োই দরকার।

২১৩। ঝড় উঠ্‌লে অশ্বত্থগাছ, বটগাছ চেনা যায় না। জ্ঞান-চৈতন্য উদয় হ'লে জাতিভেদ থাকে না।

২১৪। ঘা শুকোলে আপনা হ'তে ছাল উঠে যায়। টেনে ছিঁড়লেই রক্ত পড়ে। জ্ঞান-চৈতন্য হ'লে সেইরূপ জাত থাকে না, কিন্তু অজ্ঞানীর জাতি ভেদ নষ্ট করা দোষ।

২১৫। বাহ্যিক চিহ্ন উপবীত রাখা কি ঠিক?—আত্মজ্ঞান লাভ ক'রলে আর কোনো বন্ধন থাকে না; তখন তার সকল বন্ধন আপনি খসে যায়, তখন বামুন শুদ্দুর বোধ থাকে না, এ অবস্থায় পৈতে আপনি প'ড়ে যায়। যখন সে বোধ থাকে তখন জোর ক'রে ফেলা উচিত নয়।

২১৬। আপনি স্ত্রী নিয়ে ঘর করেন না কেন?—কার্তিক একদিন একটা বেড়ালকে নখ দিয়ে আঁচড়েছিল। পরদিন নিজের মা'র গালে একটা নখচিহ্ন দেখে সে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, 'মা, তোমার গালে নখের দাগ কেন?'—জগজ্জননী বললেন, 'বাপ! এ তোমারই নখের দাগ।' কার্তিক বললে, 'আমার নখের দাগ তোমার গালে কী ক'রে গেল? মা বললেন, 'বাপ! কাল তুমি একটি বেড়ালকে নখ দিয়ে আঁচড়েছিলে মনে নেই?' কার্তিক বললে, বেড়ালকে আঁচড়ালুম, তা তোমার গালে দাগ হ'লো কী ক'রে?'—মা বললেন, 'বাপ! এ জগতে আমা ছাড়া কোনো জীবজন্তু নেই; তুমি যাকেই আঘাত করো না কেন, আমাকেই আঘাত করা হবে।' কার্তিক বিস্মিত হ'লেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, এ-জীবনে আর বিয়ে করলেন না। তিনি কাকে বিয়ে করবেন? যাকেই বিয়ে করবেন তিনিই তাঁর মা। সর্বত্র মাতৃবোধ হওয়াতে তাঁর বিয়ে করা হ'লো না। আমারও সেই দশা, আমি স্ত্রীলোক মাত্রকেই মা বলে জ্ঞান করি।

২১৭। আমি গেরস্তদের মেয়েদের দেখি, আমার সচ্চিদানন্দময়ী মা ঘোমটা দিয়ে সতী সেজে রয়েছে, আবার যখন মেছোবাজারে মেয়েরা বারাণ্ডার উপর হুঁকো হাতে মাথার কাপড় খুলে গয়না প'রে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি তখন দেখি যে সচ্চিদানন্দময়ী মা খান্‌কি সেজে আরেক রকম খেলা করছে।

২১৮। গ্যাসের আলো নানাস্থানে নানাভাবে জ্বলছে, কিন্তু এক আধার হ'তে আসছে। নানা দেশের নানা জাতির ধার্মিক লোক সেই এক পরমেশ্বর হ'তে আসছে।

২১৯। বাড়ির ছাদের জল যেমন বাঘমুখো অথবা অন্য প্রকার নল দিয়ে পড়ে, কিন্তু সে-জল তাদের নয়, আকাশের—সেই রকম সাধু ভক্তদের মুখ দিয়ে যে-সকল সত্য ও স্বর্গীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয় সে-সকল তাঁদের নিজের নয়, ঈশ্বরের।

২২০। সব শেয়ালের এক রা। তেমনি জগতের সমস্ত সাধকের শিক্ষাই মূলত এক।

২২১। যা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় তাতেই সচ্চিদানন্দের অংশ আছে, তবে কিনা কম আর বেশি। যেমন চিটে গুড় আর ওলা মিছরিতে মিষ্টতা আছে—কম আর বেশি।

২২২। পরচর্চা ক'রতে গেলে আত্ম ও পরমাত্ম দুই চর্চাই ভুল হয়।

২২৩। কুপ্রবৃত্তির মধ্যে যখন মন বাস করে তখন হাড়ি-পাড়ায় বাস করে।

২২৪। যেমন উকিলকে দেখলে মোকদ্দমার কথা মনে পড়ে, সেই রকম ভক্তকে দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে।

২২৫। নিকটস্থ আত্মীয়জনেরা সাধু-মহাজনদের অগ্রাহ্য করে, দূরস্থ লোকদের কাছে তাঁদের আদর হয়, এর কারণ কী?—বাজীকরের বাজী তাদের আত্মীয় লোকেরা দেখে না, দূরের লোক দেখে অবাক হ'য়ে যায়।

২২৬। বজ্র বাঁটুলের বীচি গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে গিয়ে দূরে পড়ে আর সেখানে গাছ হয়। তেমনি, ধর্ম প্রচারকদের ভাব দূরেই প্রকাশ হয় ও লোকে আদর করে।

২২৭। লণ্ঠনের নিচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম মহাপুরুষদের কাছের লোকেরা বুঝতে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

২২৮। স্রোতের জল বেগে যেতে যেতে এক এক জায়গায় ঘুরতে থাকে, কিন্তু তখুনি আবার সোজা হ'য়ে বেগে চলে যায়।—পবিত্রাত্মা ধার্মিকদের মনেও কখনো কখনো অবিশ্বাস, নিরাশা, দুঃখ প্রভৃতির আভা পড়ে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। শিগগির চলে যায়।

২২৯। যে-বৃক্ষ ফলবান হয়, নুয়ে পড়ে। বড়ো হবে তো ছোটো হও।

২৩০। 'সতের রাগ; জলের দাগ।' অর্থাৎ অল্পক্ষণ স্থায়ী।

২৩১। সাদা কাপড়ে যদি একটু কালির দাগ থাকে তবে বড্ডো বেশি দেখায়। পবিত্র লোকের অল্প দোষ বেশি দেখায়।

২৩২। সূর্য-কিরণ সব জায়গায় সমান হ'লেও জলের ভিতর, আর্শিতে ও সব রকম স্বচ্ছ জিনিসের ভিতর বেশি উজ্জ্বল দেখায়। ঈশ্বরের প্রকাশ সকল হৃদয়ে সমান হ'লেও সাধুদের হৃদয়ে বেশি প্রকাশ পায়।

২৩৩। কাঁচে পারা মাখানো থাকলে যেমন মুখ দেখা যায় শুক্র ধারণ করলে তেমনি ব্রহ্ম দেখা যায়।

২৩৪। শিশুর মতো সরল না-হ'লে দিব্যজ্ঞান হয় না। বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে শিশুর মতো অবোধ হও তো সত্যকে পাবে।

২৩৫। পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না। তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্মকথা লেখা আছে, কিন্তু পড়লে ধর্ম হয় না—সাধনা চাই।

২৩৬। ধর্ম বিকৃত ভাব ধারণ করে কেন?—আকাশের জল নির্মল ও পরিষ্কার, কিন্তু যখন ছাদ ও নল দিয়ে বেরোয় তখন ঘোলা ও ময়লা হ'য়ে যায়।

২৩৭। টাকায় ডাল-ভাত হয়, ঈশ্বর লাভ হয় না। সুতরাং টাকা কখনো জীবনের চরম লক্ষ্য হ'তে পারে না।

২৩৮। ভালো ইস্পাত বানাতে গেলে লোহাকে বারংবার পুড়িয়ে-পিটিয়ে নিতে হয়। তারপর সেই ইস্পাত দিয়ে ধারালো তরবারি তৈরি হয়, তখন তাকে ইচ্ছে মতো বাঁকিয়ে-চুরিয়ে নেয়া যায়। তেমনি, বারংবার কষ্টের আগুনে পুড়ে ও সংসারের ঘা খেয়ে-খেয়ে নম্র ও শুদ্ধ হয়।

২৩৯। যত মত তত পথ। আপনার মতে নিষ্ঠা রেখো, কিন্তু অপরের মতের দ্বেষ বা নিন্দা কোরো না।

২৪০। একজন শৈব ছিল। তার ভক্তির জোরে ভগবান শূলপাণি তাকে দেখা দিয়ে বললেন : 'দেখ বাপু, তোমার ভক্তিতে আমায় তুমি দেখতে পেলে বটে, কিন্তু যত দিন না কমলাপতি হরির প্রতি তোমার বিদ্বেষ ভাব যাবে ততদিন আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হবো না।' শৈব এই কথায় ঘাড় হেঁট করে রইল। ভগবান সেখান থেকে চলে গেলেন। শৈব আবার সাধনা করতে লাগলো, তার সাধনায় ঠাকুরকে অস্থির ক'রে তুললো এবং পুনরায় ঠাকুরকে এসে দর্শন দিতে হ'লো। কিন্তু ঠাকুর এবার অর্ধ হর ও অর্ধ হরি মূর্তিতে তার নিকট আবির্ভূত হলেন। শৈব হরের অর্ধ-মূর্তি দেখে অর্ধ আনন্দিত ও হরির অর্ধ-মূর্তি দেখে অর্ধ নিরানন্দিত হলেন। তারপর তিনি ইষ্ট দেবতার পূজা করতে আরম্ভ করলেন এবং সর্ব প্রথমে শিব মূর্তির পদটি ধৌত করলেন, কিন্তু হরি-মূর্তির পদস্পর্শ দূরে থাক, সে-দিকে, একবার ফিরেও দেখলেন না। ভগবান শূলপাণি বললেন, 'দেখ, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে, কিন্তু দ্বেষভাবের জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট পেতে হবে। আমি কৃপা ক'রে তোমাকে আমার হরিহর মূর্তি দেখালাম, হরিতে আর আমাতে যে অভিন্ন

তা-ই তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রলাম, তুমি কিন্তু তা বুঝতে পারলে না।'
শৈব সেই কথা শুনে এক গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে গ্রামের সকলে তাঁকে চিনতে পারলো, এবং অবশেষে এমন অবস্থা হ'লো যে, তাঁকে দেখলেই গ্রামের বালকেরা 'হরি হরি' বলে হাততালি দিতে আরম্ভ করলো। শৈব নিরুপায় হ'য়ে শেষে আপন কানে দুটো ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিলেন, এবং যেই বালকেরা হরিধ্বনি করতো তিনিও অমনি সজোরে ঘণ্টা বাজাতেন, এবং সেই ঘণ্টাধ্বনিতে হরিনাম তিনি শুনতে পেতেন না। এঁরই নাম ঘণ্টাকর্ণ।

আপন ইষ্ট মূর্তির ওপর বিশেষ নিষ্ঠা রাখবে, কিন্তু অন্যান্য মূর্তিকেও সেই ইষ্ট মূর্তির ভিন্ন রূপ ভাববে ও শ্রদ্ধা করবে। দ্বেষভাব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে।

২৪১। শ্বশুড়-শাশুড়ি, ঘরের অন্যান্য সকলের প্রতি সতী স্ত্রীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, কিন্তু মন পড়ে থাকে স্বামীর দিকে। তেমনি তোমার ইষ্টদেবতায় ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় রাখবে, কিন্তু অন্য দেবতায় দ্বেষভাব না-রেখে শ্রদ্ধা করবে।

২৪২। প্রকৃত সাধক ব্যক্তি ভাববেন, অপরের যে-ধর্ম বুঝি তা-ও বটে, বুঝি তা-ও বটে।

২৪৩। ব্রাহ্মধর্মে ও হিন্দুধর্মে প্রভেদ কী? যেমন পোঁ বাজানো ও সুর বার করা। ব্রাহ্মধর্ম এক ব্রহ্মের পোঁ ধ'রে আছে, হিন্দুধর্ম তার ওপর নানা রকম সুর-তান-লয় বার করছে।

২৪৪। একসময় যখন হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের ঘোর আন্দোলন চলছে তখন একজন গিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মতামত জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন : 'আমি দেখছি, আমার মা উভয়কে দিয়েই আপন কাজ সেরে নিচ্ছেন।'

২৪৫। তিনি আমাদের হৃদয় হরণ করেন বলেই তাঁর নাম 'হরি'। আর 'হরি বলা' মানে হরি আমাদের শক্তি।

২৪৬। পাপ আর পারা চাপা থাকে না।

২৪৭। অনুতাপের অশ্রু আর আনন্দের অশ্রু চোখের দু'দিক দিয়ে পড়ে। নাকের দিকে চোখের যে-কোণ সে-দিক দিয়ে অনুতাপের ও অন্য দিক দিয়ে আনন্দের অশ্রু পড়ে।

২৪৮। সিদ্ধাইদের কাছে যেতে নেই। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবৎপাদপদ্ম থেকে সরে গিয়ে সামান্য শক্তিলাভের বাসনায় সিদ্ধাইদের মন আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে।

২৪৯। এক ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসর নির্জনে সাধনা ক'রে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। আহ্লাদে গদগদ হ'য়ে সে তার গুরুকে গিয়ে বললে তার এই সিদ্ধির কথা। গুরু বললেন : 'ছি, ছি, চোদ্দ বছর কঠোর তপস্যা ক'রে তুই যা শিখেছিস লোকে আধ পয়সা খরচ ক'রে তা-ই করে।'

২৫০। শ্রীরামকৃষ্ণের এক যুবক শিষ্য একদা অন্যের মনের কথা পাঠ করার ক্ষমতা লাভ করলো। গুরুকে সে-কথা জানাতে তিনি শিষ্যকে তিরস্কার করলেন : 'ছি, ছি, ওদিকে খেয়াল করিস নি।'

২৫১। লোকের ময়লা কাপড় নিয়ে ধোপা ভাঁড়ারি হয়। কাপড় পরিষ্কার হলেই তার ভাঁড়ার খালি হ'য়ে যায়। এজন্য পরমহংসদেব বলতেন, 'ধোপা ভাঁড়ারি হোস্ নি।'

২৫২। এক নাপিত পথে চলতে-চলতে হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন বলছে, 'সাত ঘড়া টাকা নিবি?' নাপিত আশ্চর্য হ'য়ে চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। সাত ঘড়া টাকার নাম শুনে সে কিঞ্চিৎ লুব্ধ হ'য়ে ব্যাপারটা কী জানবার জন্যে চেঁচিয়ে বললে, 'নেবো।' অমনি সে আবার শুনতে পেলে কে যেন বললো, 'আচ্ছা, তোর বাড়িতে দিয়ে এলুম, নিগে, যা।' নাপিত বাড়ি গিয়ে দেখে যথার্থই তার ঘরে ঘড়া রয়েছে। নাপিত ভালো ক'রে নেড়েচেড়ে দেখতে পেলে ছ'টি ঘড়া মোহরে ভরা আর একটি ঘড়া খালি পড়ে আছে। খালি ঘড়াটি ভর্তি করবার জন্য তার একান্ত ইচ্ছা হ'লো এবং তার ঘরে সোনা-রূপো যা কিছু ছিলো সব এনে সেই খালি ঘড়ার মধ্যে পুরলে, কিন্তু তাতে সে-ঘড়া পুরবে কেন? নাপিত সংসারের খরচ কমিয়ে রোজ রোজ সেই ঘড়ায় পুরতে লাগলো, অবশেষে কাকুতি-মিনতি ক'রে রাজা মশাইকে জানালে যে, তার সংসারে এখন ভারি কষ্ট, সে যা পায় তাতে তার চলে না। রাজা তার মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, নাপিতের যে-দশা সেই দশা। সে এক্ষণে লোকের কাছে মেগেপেতে খায় আর যা-কিছু টাকা পায় তা ঐ ঘড়ার ভেতর পোরে। পরে রাজা একদিন তার দুর্দশা দেখে বললেন, 'হ্যাঁ রে, আগে তুই কম মাইনে পেতিস তাতে তো বেশ চলতো, আর এখন তুই দ্বিগুণ পাচ্ছিস তোর চলে না কেন রে? তুই কি সাত ঘড়া মোহর এনেছিস নাকি?' নাপিত থতমত খেয়ে বললে, 'আজ্ঞে আপনাকে কে বললে?' রাজা বললেন, 'আরে সে যে যকের ধন, সেই যক্ষটা আমার কাছে এসে বলেছিল : সাত ঘড়া টাকা নেবে?—তা আমি বললুম :

জমার টাকা, না খরচের টাকা ?—যক্ষটা অমনি পালিয়ে গেল, আর কোন কথা কইল না। আরে, ও-টাকা কি নিতে আছে! ও-টাকা খরচ করবার জো নেই, ও কেবলই জমার টাকা, ভালো চাস তো ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'—নাপিত ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি সেই জায়গায় গিয়ে বললে, 'তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমার কাজ নেই।' যক্ষ বললো, 'আচ্ছা।' বাড়ি ফিরে এসে নাপিত দেখলো ঘড়াগুলো কে নিয়ে গিয়েছে। লাভের মধ্যে সেই সঙ্গে সে এতকাল ধ'রে সেই খালি ঘড়াটার মধ্যে যা পুরেছিল তা-ও নিয়ে গিয়েছে। ধর্মরাজ্যে তেমনি, জমা-খরচ বোধ না-থাকলে শেষে সর্বস্ব হারাতে হয়।

২৫৩। দাদ চুলকে সুখ, কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির ক'রে তোলে। সংসারও সেই রকম : প্রথম-প্রথম বড়ো সুখ, পরে জ্বালায় অস্থির করে দেয়।

২৫৪। সংসার কেমন ? —যেমন আমড়া। শাঁসের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া, খেলে হয় অম্বলশূল।

২৫৫। কৃপণের যেমন টাকাতে মন, তাঁর প্রতি তেমন মন চাই।

২৫৬। ময়লা আয়নাতে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ, ময়লা ও অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধাত্মা দেখতে পান। অতএব বিশুদ্ধ হবার চেষ্টা করো।

২৫৭। তরঙ্গময় ময়লা জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব যেমন খণ্ড খণ্ড দেখায় মায়াময় সংসারী মানবের অন্তরে তেমনি ঈশ্বরের আংশিক আভা মাত্র দেখা যায়।

২৫৮। ভক্তেরা ভগবানের জন্য সব ছেড়ে-ছুড়ে দেন কেন ?—পতঙ্গ একবার আলো দেখলে আর অন্ধকারে যায় না, পিঁপড়ে গুড়ে প্রাণ দেয়, তবু ফেরে না। ভক্তও সেই রকম ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দেয়, তবু অন্য-কিছু চায় না।

২৫৯। মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন বাড়ির ছাদে ওঠা যায়, তেমনি ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে, প্রত্যেক ধর্মই এক-একটি উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে।

২৬০। ঈশ্বর যদি সর্বত্র বিদ্যমান তবে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না কেন ? —পানায় ঢাকা পুকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে তোমরা বলছো, পুকুরে জল নেই। যদি জল দেখতে চাও তবে পানা সরিয়ে ফেলো। মায়ায় ঢাকা চোখ নিয়ে তোমরা বলছো, ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাইনে কেন ? যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও তবে মায়াকে সরিয়ে ফেলো।

২৬১। মা আনন্দময়ীকে আমরা দেখতে পাইনে কেন ?—ইনি বড়ো লোকের মেয়ে চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা মায়ারূপ চিকের ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখেন।

২৬২। তর্ক কোরো না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর করো অন্যকেও তার মতের উপর সেই রকম নির্ভর করতে দাও। মিছে তর্কে কাউকেই তার ভুল বোঝাতে পারবে না। ঈশ্বরের কৃপা হ'লেই সকলে আপন-আপন ভুল বুঝতে পারবে।

২৬৩। একজন সমস্ত দিন আখের ক্ষেতে জল দিয়ে শেষে দেখলে যে এক ফোঁটাও জল ক্ষেতে যায়নি, দূরে একটা গর্ত ছিলো, তা দিয়ে সমস্ত বেরিয়ে গেছে। সেই রকম যিনি বিষয়বাসনা, সাংসারিক মানসম্ভ্রম ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মন রেখে উপাসনা করছেন, সারা জীবন উপাসনা ক'রে শেষে তিনিও দেখতে পাবেন যে, ঐসব বাসনারূপ ছ্যাঁদা দিয়ে তাঁর সমস্ত উপাসনা বেরিয়ে গেছে, তিনি যেমন মানুষ তেমনি পড়ে আছেন, একটুও উন্নতি করতে পারেন নি।

২৬৪। যে-সব লোক উপাসনা করলে ঠাট্টা করে, ধর্ম ও ধার্মিকদের নিন্দা করে, সাধনার সময় তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকবে।

২৬৫। দল করা কি ভালো ?—স্রোতের জলে দল হয় না, গেড়ে ডোবার বদ্ধ জলে দল হয়। যার মন ঈশ্বর পাবার জন্য দৌড়েছে তার আর-কোনো দিকে দৃষ্টি থাকে না। যে মান-সম্ভ্রমের দিকে চেয়ে আছে সেই দল বাঁধতে যায়।

২৬৬। বেদ, তন্ত্র, পুরাণ সমস্তই উচ্ছিষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, কেননা বারংবার মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, কিন্তু ব্রহ্ম এ-পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয়নি কেননা কেউই তাঁকে আজও মুখে বলতে পারেনি।

২৬৭। মায়াকে চিনতে পারলে সে তখুনি পালায়। এক গুরু শিষ্য-বাড়ি যাচ্ছিলেন, সঙ্গে চাকর ছিল না। পথের মাঝে এক মুচিকে দেখতে পেয়ে বললেন : 'ওরে, আমার সঙ্গে যাবি ? ভালো খেতে-পরতে পাবি, আদরে থাকবি, চল না।' মুচি বললে : 'ঠাকুর মশাই, আমি অতি নীচ জাত, কেমন ক'রে আপনার চাকর হ'য়ে যাব ?' গুরু বললেন : 'তাতে তোর কোনো চিন্তা নেই। তুই কাউকে তোর পরিচয় দিসনি কিংবা কারো সঙ্গে আলাপ করিস নি।' মুচি রাজি হ'য়ে গেল। সন্ধ্যার সময় শিষ্য-বাড়িতে গুরু সন্ধ্যা-আহ্নিক করছেন এমন সময় আরেক-জন ব্রাহ্মণ এসে সেই চাকরকে বললেন ; 'অমুক জায়গা থেকে আমার জুতো-

জোড়াটা এনে দে তো।' চাকর কথা কইলে না। ব্রাহ্মণ আবার বললেন, সে তাতেও চুপ ক'রে রইলো। ব্রাহ্মণ তিন-চারবার বললেন, সে তবুও নড়লো না। শেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'আরে বেটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিসনে, তুই কী জাত, মুচি নাকি?' মুচি এ-কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'ঠাকুর মশাই গো, ঠাকুর মশাই, আমায় চিনেছে, আমি পালাই।'

২৬৮। জীবাত্মা ও পরমাত্মা কিরূপ?—যেমন স্রোতের জলে একটা লাঠি বা তক্তা আড় ক'রে ধ'রলে দু'ভাগ দেখায়, তেমনি অখণ্ড পরমাত্মা মায়ারূপ উপাধি দ্বারা দু'ভাগ দেখায়।

২৬৯। জাহাজের কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে, তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে তাহ'লে কোনো ভয় থাকে না।

২৭০। একদিন মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে অবধূত দেখতে পেলেন, সুমুখে ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে মহা সমারোহে একটি বর আসছে, পাশে একটা ব্যাধ এক মনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে। এমন যে জাঁকজমকে বর আসছে, তার দিকে সে একবার চেয়েও দেখছে না। অবধূত সেই ব্যাধকে নমস্কার ক'রে বললেন, 'প্রভু, তুমি আমার গুরু, যখন আমি ধ্যানে ব'সবো তখন যেন ঐ রকম লক্ষ্য থাকে।'

২৭১। একজন মাছ ধ'রছে, অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, অমুক জায়গায় কোন পথে যাবো?' তখন তার ফাৎনায় মাছ খাচ্চে, সে কোনো উত্তর না-দিয়ে আপনার মনে ফাৎনার দিকে লক্ষ্য রাখলো। কাজ শেষ ক'রে পিছন ফিরে বললে, 'আপনি কী বলছেন?' অবধূত প্রণাম ক'রে বললেন, 'আপনি আমার গুরু, আমি যখন পরমাত্মার ধ্যানে ব'সবো তখন যেন এই রকম আপন কাজ শেষ না-ক'রে অন্যদিকে মন না-দিই।'

২৭২। এক বক আস্তে-আস্তে একটা মাছ ধ'রতে যাচ্ছে, পেছনে এক ব্যাধ সেই বককে লক্ষ্য করছে; কিন্তু বক সে-দিকে চেয়েও দেখছে না। অবধূত সেই বককে প্রণাম ক'রে বললেন, আমি যখন ধ্যানে বসবো তখন যেন ঐ রকম পেছনে চেয়ে না দেখি।'

২৭৩। একটা চিল মাছ মুখে ক'রে যাচ্ছে, শত শত কাক-চিল এসে তার পিছনে ঠুকরে কামড়ে বিরক্ত ক'রে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। সে যে-দিকে যায়

সমস্ত কাক-চিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছন-পেছন যায়। শেষে সে অতিষ্ঠ হ'য়ে মাছটা ফেলে দিলে। আরেকটা চিল এসে সেটা নিলে, সমস্ত কাক-চিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছনে ছুটতে লাগলো। প্রথম চিলটি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক গাছে ব'সে রইলো। অবধূত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখে প্রণাম ক'রে বললেন, বুঝলুম সংসারের ভার ফেলে দিতে পারলেই শান্তি; নতুবা মহা বিপদ।

২৭৪। মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে।
জগৎ গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে ॥

২৭৫। ছুঁচে সুতো পরাবে তো সরু করো। মনকে ঈশ্বরে মগ্ন করাবে তো দীন হীন অকিঞ্চন হও।

২৭৬। এক সাপ গুরু-উপদেশে ঈশ্বরপরায়ণ হয়েছিল। সে আর হিংসা করতো না, কাউকে কামড়াতো না। পাড়ার ছেলেগুলো এসে সেই সাপকে আঘাত করতে লাগলো, কিন্তু ভক্ত সাপ কাউকে কামড়ালো না। আঘাতের চোটে তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হ'লো, তবু সে কাউকে কামড়াতে চেষ্টা করলো না। তারপর গুরু এসে সাপের দুর্দশা দেখলেন। তিনি বললেন, 'বাপু! হিংসা ত্যাগ করেছো, ভালোই, কিন্তু ফোঁস করতে ছেড়ো না। যখন কেউ মারতে আসবে তখন ফোঁস কোরো কিন্তু কামড়িয়ো না।'

২৭৭। খাঁচা থেকে পাখি উড়ে গেলে কেউ খাঁচার আদর করে না; তেমনি এই দেহ-খাঁচা থেকে প্রাণ-পাখি উড়ে গেলে কেউ এ-খাঁচার আদর করে না।

২৭৮। ঈশ্বর কোথায় আছেন? তাঁকে কী ক'রে পাওয়া যায়?—সমুদ্রে রত্ন আছে, যত্ন চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন, সাধনা চাই।

২৭৯। শর্ষের পুঁটলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়নো ভার হ'য়ে ওঠে, মানুষের মন তেমনি একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে স্থির করা ভার হ'য়ে ওঠে।

২৮০। জলে নৌকো থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকোয় যেন জল না-থাকে। সাধক সংসারে থাক, ক্ষতি নেই—কিন্তু সাধকের ভেতর যেন সংসার না-থাকে।

২৮১। গুরুকে যে করে মনুষ্য জ্ঞান,
কী করিবে তার সাধন ভজন ॥

২৮২। মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা। নতুবা মুখে বলছি 'তুমি আমার সর্বস্ব' আর মন বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে আছি—এ-রকম লোকের সকল সাধনাই বিফল।

২৮৩। চারা গাছকে প্রথমে বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হয়, না-হ'লে ছাগল-গরু এসে তাকে নষ্ট ক'রে ফেলে। গাছ একবার বড়ো হ'লে আর সে-ভয় থাকে না, তখন শত-শত গরু-ছাগল এসে তার তলায় আশ্রয় নেয় ও তার পাতায় পেট ভরায়। সাধনার প্রথম অবস্থায় আপনাকে কুসঙ্গ, বিষয়বুদ্ধি ও সংসার ইত্যাদি থেকে রক্ষা করতে হবে, না-করলে সমুদয় ধর্মভাব নষ্ট ক'রে ফেলবে। কিন্তু একবার সিদ্ধ হ'লে আর কোনো ভয় নেই। হাজার-হাজার সংসার ও কুসঙ্গ তখন তোমায় নষ্ট করতে পারবে না, বরং অনেকে তোমার কাছে এসে শান্তি পাবে।

২৮৪। হাতির গা পরিষ্কার ক'রে দিলে তখুনি ময়লা ক'রে ফেলে। কিন্তু গা পরিষ্কার ক'রে যদি ঘরের ভিতর বন্ধ ক'রে রাখা যায়, তা হ'লে আর গা ময়লা হয় না। সংসারের মধ্যে যতই পবিত্রতা লাভ করো না কেন, আবার অপবিত্র হ'য়ে পড়বে। মনকে পবিত্র ক'রে ঈশ্বরের উপর বদ্ধ ক'রে রাখলে পবিত্র থাকবে, সংসারে ছেড়ে দিলে আবার ময়লা হ'য়ে যাবে।

২৮৫। সাধকের বল কোথায়?—সাধকের বল তার চোখের জলে। নাছোড়বান্দা সন্তানের কান্না শুনে মা যেমন তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তেমনি যে-সাধক সরল শিশুর মতো ব্যাকুল অন্তরে কাঁদেন তাকে ভগবান দেখা না-দিয়ে থাকতে পারেন না।

২৮৬। ধ্যান ক'রবে কোণে, বনে আর মনে।

২৮৭। মনকে একাগ্র করবার জন্য ধ্যান করবার আগে হাততালি দিয়ে খানিকক্ষণ 'হরিবোল, হরিবোল' বলবে। গাছের তলায় হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখি উড়ে যায়, তেমনি 'হরিবোল, হরিবোল' বললে কুচিন্তা মন থেকে চলে যায়।

২৮৮। মাছ এক, কিন্তু ঝালে, ঝোলে, অম্বলে নানা রকমে যেমন তাকে আস্বাদ করা যায়, তেমনি ভগবান এক হলেও সাধকগণ তাঁকে বিভিন্ন রকমে উপভোগ ক'রে থাকেন।

২৮৯। যেখানে দশজন গড় করে সেখানে তোমরাও গড় কোরো, কেননা সেখানে ভগবানের বিভূতি অধিক পরিমাণে আছে বুঝতে হবে।

২৯০। এক সের দুধে এক ছটাক জল থাকলে সহজে অল্প জালে ক্ষীর করা যায়, আর এক সের দুধে তিন পো জল থাকলে সহজে ক্ষীর হয় না, অনেকক্ষণ জাল দিতে হয়, শেষে হয়তো হয়ই না। সেই রকম বালকের মনে বিষয় বাসনা

খুবই কম, এজন্য একটুতেই ঈশ্বরের দিকে যায় ; কিন্তু বড়োদের মনে বিষয় বাসনা গজ গজ করে, তাই তাদের মন সহজে তাঁর দিকে যায় না।

২৯১। গৃহস্থের অভিমান কুঁচ গাছের শিকড়, সহজে উৎপাটিত হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীর অভিমান অশ্বত্থের মূল, কোনো মতে উৎপাটিত হয় না।

২৯২। খৈ ভাজতে-ভাজতে যেটা ছিটকে খোলার বাইরে পড়ে সেটা বেদাগ হয়। আর যে-গুলো খোলার ভিতর থাকে, সেগুলো খৈ হয় বটে, কিন্তু দাগ থাকে। সাধনা করতে-করতে যারা সংসারের বাহিরে গিয়ে পড়ে তারাই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারে। সংসারের ভিতর থেকে সিদ্ধিলাভ করা যায় বটে, কিন্তু কিছু না কিছু দাগ থেকে যায়।

২৯৩। মায়াকে চিনতে পারলেই মায়া আপনি পালায় ; যেমন চোর বাড়ি এসেছে, গেরস্থ টের পেলে চোর আপনি পালায়।

২৯৪। তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা কি আবশ্যক ?—তিনি পিঁপড়ের পায়ের শব্দও শুনতে পান। তোমার যে-রকমে ইচ্ছে ডেকো, তিনি শুনতে পাবেন।

২৯৫। শাস্ত্র প'ড়ে লোককে ঈশ্বর বোঝানো আর ছবিতে কাশী দেখে লোককে কাশী বোঝানো একই কথা।

২৯৬। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আঠা লাগে না। তেমনি জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে থাকলে কামিনী-কাঞ্চনের ময়লা লাগে না।

২৯৭। সাঁতার শিখতে হ'লে অনেক দিন জলে হাত-পা ছুঁড়তে হয় একেবারে সাঁতার দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম-সাগরে সাঁতার শিখতে হলেও আগে অনেকবার উঠতে-পড়তে হয়, একবারেই হয় না।

২৯৮। পায়ে কাঁটা ফুটলে যেমন আরেকটা কাঁটা দিয়ে বার ক'রে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দেয়, সেই রকম অবিদ্যা নাশ ক'রতে হ'লে বিদ্যা মায়ার দরকার হয়। শেষে জ্ঞান লাভ হ'লে বিদ্যা অবিদ্যা দু'টোই চলে যায়।

২৯৯। কচি বাঁশ সহজে নোয়ানো যায়, পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙে যায়। ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বুড়ো কালে টানতে গেলে ছেড়ে পালায়।

৩০০। রেলগাড়ি অনায়াসেই ভারি বোঝাই নিয়ে যায়। বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানও এই সংসারের ভার মাথায় নিয়ে অনায়াসে তাঁর উপর ভক্তি-বিশ্বাস রেখে চলে যান, কোনো কষ্ট বোধ করেন না।

৩০১। হিন্দুস্থানী মেয়েরা মাথায় ক'রে চার-পাঁচটি জল-ভরা কলসী নিয়ে যায়, পথে আত্মীয়দের সঙ্গে গল্প করে, সুখ-দুঃখের কথা কয়, কিন্তু তাদের মন থাকে কলসীর উপর, যেন সেগুলো পড়ে না-যায়। ধর্মপথের পথিকদেরও সকল অবস্থার ভিতরে ঐ রকম দৃষ্টি রাখতে হবে, মন যেন তার পথ থেকে সরে না-যায়।

৩০২। যাত্রার দলে যতক্ষণ খোল খচ্‌মচ্‌ করছে, 'কৃষ্ণ এসো হে' 'কৃষ্ণ এসো হে' বলে চীৎকার ক'রে গান করছে, কৃষ্ণের তখন ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আপন মনে সাজঘরে তামাক খাচ্ছে আর গল্প করছে; যখন সে-সব থামলো, নারদ ঋষি মৃদুস্বরে প্রেমভরে গান ধরলেন, কৃষ্ণ আর থাকতে পারলেন না, অমনি ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে আসরে নেমে পড়লেন। সাধকের ভিতরেও সেই রূপ। তখন সাধক 'প্রভু এসো হে!' 'প্রভু এসো হে!' বলে চেঁচাচ্ছে ততক্ষণ জেনো প্রভু সেখানে আসেন না। প্রভু যখন আসবেন সাধক তখন ভাবে গদগদ হবে, আর চেঁচাবে না। সাধক যখন গদগদ ভাবে ডাকে, তখন প্রভু আর দেরী করতে পারেন না।

৩০৩। আত্মসমর্পণ চেয়ে সহজ সাধনা আর নেই। আত্মসমর্পণ—আমার বলে কোনো অহংকার মনে না থাকা।

৩০৪। নির্ভরতা কেমন? অত্যন্ত পরিশ্রমের পর যেমন তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক টানা।

৩০৫। বদ্ধজীব হরিনাম আপনি শোনে না, পরকেও শুনতে দেয় না—ধর্মসমাজ ও ধার্মিকদের নিন্দা করে এবং উপাসনা করলে ঠাট্টা করে।

৩০৬। অসতী স্ত্রীলোক বাপ, মা ও সমস্ত পরিবারের ভিতর থেকে সংসারের কাজ-কর্ম করে, কিন্তু তার মন থাকে সেই উপপতির প্রতি। হে সংসারী জীব! মন ঈশ্বরে রেখে তুমিও বাপ মা ও পরিবারের কাজ কোরো।

৩০৭। মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে অন্যকে ও ঈশ্বরকে চিনতে পারে। আমি কে? হাত, পা, রক্ত, মাংস, আত্মা—এর কোনটা আমি? ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোনো জিনিস নেই। প্যাজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে প্যাজ বলে যেমন কোনো জিনিস থাকে না, 'আমি কে' বিচার করলে তেমনি 'আমি' বলে কিছুই পাইনা। শেষে যা থাকে তা ঈশ্বর। আমিত্ব দূর হলে ঈশ্বর দেখা দেন।

৩০৮। কলিকালে ঈশ্বরের নাম করাই একমাত্র সাধনা।

৩০৯। ঈশ্বরকে দেখবার ইচ্ছা থাকলে নামে বিশ্বাস ও সদসৎ বিচার করা চাই।

৩১০। হাতিকে ছেড়ে দিলে চারিদিকের গাছপালা ভাঙতে-ভাঙতে যায়; কিন্তু তার মাথায় ডাঙ্গস মারলে ঠাণ্ডা হয়। মনকে ছেড়ে দিলে সে নানা কথা ভাবে, কিন্তু বিবেকরূপ ডাঙ্গস মারলে সে স্থির হয়।

৩১১। উপাসনা কতক্ষণ দরকার? যতক্ষণ নামে অশ্রুপাত না-হয়। হরিনাম শুনলে যাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে, তাঁর আর উপাসনা করবার দরকার নেই।

৩১২। সাধুসঙ্গ ধর্মসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ জানবে।

৩১৩। মরবার আগে মনে যে-ভাব হয়, পরজন্মে সেই আকার ধরে, সেইজন্য সাধনার দরকার। ক্রমাগত অভ্যাসে মনে আর কোনো ভাব ওঠে না, তখন ঈশ্বরই মনে পড়ে।

৩১৪। মানবীয় ভাব কেমন ক'রে যায়? —ফল বড়ো হ'লে ফুল আপনি খসে যায়, দেবত্ব বাড়লে নরত্ব থাকে না।

৩১৫। বিষয় বাসনা কিরূপে দূর হয়? —অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোটি-কোটি সুখের জমাট বাঁধা; তাঁকে যারা সম্ভোগ করেন তাদের আর বিষয়সুখ ভালো লাগে না।

৩১৬। হৃদয়ের কিরূপ অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয়? —হৃদয় স্থির হ'লে ঈশ্বর দর্শন হয়। হৃদয়রূপ সরোবর যখন কামনারূপ বায়ুতে চঞ্চল থাকে তখন ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব।

৩১৭। ঈশ্বরকে কী প্রকারে লাভ করা যায়? —রাঙ্গামুড়ো রুইমাছ ধরতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য ধ'রে বসে থাকতে হয়, তেমনি ধৈর্য ধ'রে সাধনা করা চাই।

৩১৮। সাধুসঙ্গ চালের জলের মতো। চালের জলে নেশা কাটায়। সংসার-মদে মত্ত জীবের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

৩১৯। মফঃস্বলের নায়েব প্রজার উপর কত অত্যাচার করে, কিন্তু জমিদারের কাছে এসে সকালে-বিকেলে জপতপ করে, প্রজার উপর খুব সদ্ব্যবহার করে, কোনো রকম নালিশ উপস্থিত হ'লে বিশেষরূপ তদন্ত ক'রে সদ্বিচার করতে চেষ্টা করে,—সঙ্গগুণে ও জমিদারের ভয়ে অত্যাচারী নায়েবও ভালো হয়ে যায়।

৩২০। ভিজে কাঠ উনুনের উপর রাখলে তাত লেগে তার জল শুকিয়ে জ্বলে ওঠে, সেই রকম সাধুসঙ্গ সংসারী লোকের ভিতর কামিনী-কাঞ্চনরূপ জল শুকিয়ে গিয়ে বিবেক আগুন জ্বলে ওঠে।

৩২১। কিরূপ জীবনযাপন করতে হবে?—ঝিকনে কাঠি দিয়ে যেমন মাঝে-মাঝে উনুন নেড়ে দিতে হয়, তাতে নিবু-নিবু আগুন উসকে ওঠে, সেই রকম সাধুসঙ্গ ক'রে মনকে সতেজ করা চাই।

৩২২। কাঁচা ময়দা গরম ঘিয়ে ফেলে দিলে কল্‌কল্‌ করে শব্দ হয়, কিন্তু ময়দা যত ভাজা হতে থাকে তত শব্দ কম হ'য়ে আসে। ভাজা হ'লে আর শব্দ হয় না। অল্প জ্ঞান পেয়ে মানুষ বক্তৃতা দিতে ও বাহ্য আড়ম্বর ক'রতে থাকে, কিন্তু পুরো জ্ঞান হ'লে আর আড়ম্বর থাকে না।

৩২৩। সংসারের মধ্যে বাস ক'রে যিনি সাধনা করতে পারেন তিনিই ঠিক বীব সাধক।

৩২৪। সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবতে হবে। যদি বলো কামক্রোধরূপ কুমীর ধ'রবে, তা হ'লে বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হলুদ মেখে ডুব দাও।

৩২৫। যখন কোনো খারাপ জায়গায় যাবে, তখন মা আনন্দময়ীকে সঙ্গে লয়ে যেয়ো। তাহ'লে অনেক মন্দ কাজ করবার ইচ্ছা থাকলেও তা থেকে রক্ষা পাবে। মা'র কাছে থাকলে লজ্জায় মন্দ কাজ ক'রতে পারবে না।

৩২৬। শরীরের প্রতি আসক্তি কমে কিসে?—মানুষ হাড়, মাংস, পুঁজ, রক্ত, মল ও মূত্রের আধার এ সকল বিচার করলে তার ওপর আর আসক্তি থাকে না।

৩২৭। সাধকের কোনো রূপ ভেক ধারণ করা কি ঠিক?—ভেক ধারণ ভালো, গেরুয়া প'রলে ও খোল-করতাল নিলে মুখে খেয়াল-টপ্পা আসে না। কালা-পেড়ে ধুতি প'রে বাঁকা সিঁতে কেটে ছড়ি হাতে ক'রে বেরোলে নিধুর টপ্প গাইতে ইচ্ছে হয়।

৩২৮। এক-একবার মনে বেশ ভাব হয়, কিন্তু থাকে না কেন?—বেঁশো আগুন নিবে যায়, ফু দিয়ে রাখতে হয়—সাধনা চাই।

৩২৯। 'মা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, অটল বিশ্বাস দাও'—এইভাবে প্রার্থনা করতে হয়।

৩৩০। জালার পোঁদে বিদ থাকলেই সব জল পড়ে যায়। সাধকের ভেতরে একটুও আসক্তি থাকলে সব সাধনা বেরিয়ে যায়।

৩৩১। মাখন প্রস্তুত ক'রে জলের হাঁড়িতে রাখলে ভালো থাকবে, কিন্তু দৈয়ের হাঁড়িতে রাখলে ভ্যাস ভ্যাস ক'রবে। সিদ্ধ হ'য়ে সংসারের ভিতর থাকলে কিছু ময়লা লাগতে পারে, কিন্তু বাইরে থাকলে নির্মল থাকবে।

৩৩২। কালির ঘরে যত সাবধানে থাকো না কেন গায়ে দাগ লাগবেই লাগবে। যুবতীর কাছে অতি সাবধান হ'য়ে থাকলেও কিছু না কিছু কাম জাগবেই জাগবে।

৩৩৩। দুইজনে শব সাধনা ক'রতে গিয়ে একজন ক্ষেপে গেল, আরেকজন শেষ রাত্রে মা'র দর্শন পেয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলে, 'মা! ও ক্ষেপে গেল কেন?' তিনি বললেন, 'তুইও অমন কত জন্মে কতবার পাগল হ'য়েছিলি, তারপর আমার দেখা পেলি।'

৩৩৪। হিন্দুদের মধ্যে যখন নানা মত প্রচলিত রয়েছে, তখন আমরা কোন্ মত গ্রহণ ক'রবো? —পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন, 'ঠাকুর, সচ্চিদানন্দ রূপের খেই (মূল) কোথা?' মহাদেব বললেন, 'বিশ্বাস।'—মতে কিছু আসে যায় না, যিনি যে-মতে দীক্ষিত হ'য়েছেন বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি তার সাধনা করুন।

৩৩৫। যেমন বালককে রমন-সুখ বোঝানো যায় না তেমনি বিষয়াসক্ত মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবকে ব্রহ্মানন্দ বোঝানো যায় না।

৩৩৬। যেমন কামারশালে লোহা যতক্ষণ হাপরে থাকে ততক্ষণ লাল থাকে, হাপর থেকে বার করলেই কালো হ'য়ে যায়, সেইরকম সংসারী মানুষ যতক্ষণ ধর্মমন্দিরে বা ধার্মিক লোকের কাছে থাকে ততক্ষণ ধর্মভাবে পূর্ণ থাকে, বাইরে এলেই সে-ভাব চলে যায়।

৩৩৭। কাঁচা মাটিতে গড়ন চলে, পোড়া মাটিতে চলে না। (অর্থাৎ যার হৃদয় বিষয়-বুদ্ধিতে পুড়ে গেছে তাতে আর আর অন্য ভাব ধরে না।)

৩৩৮। যেমন জল ও জলের বুদ্বুদ। এক বুদ্বুদ যেমন জলেই ওঠে, জলেই থাকে ও জলেই মেশায়, তেমনি জীবাত্মা পরমাত্মা একই, তফাৎ এই যে বড়ো ও ছোটো—আশ্রয় ও আশ্রিত।

৩৩৯। ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে গেলে ব্যাঙ হয়, তখন সে জলেও থাকতে পারে ডাঙায়ও থাকতে পারে। অবিদ্যা রূপ ল্যাজ খসে গেলে মানুষ মুক্ত হয়। তখন সে সচ্চিদানন্দেও থাকতে পারে, সংসারেও থাকতে পারে।